উদ্ভিদখাদ্য।

কৃষিক্ষেত্র, সবজিবাগ, ফলকর, মৃত্তিকাতত্ত্ব, মালঞ্চ
প্রভৃতি রচয়িতা—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে, F. R. H. S. (Lond.)

Late Superintendent of Gardens, Raj-Durbhanga, Durbhanga ; and of the Nizamat State Gardens, Murshedabad ; formerly of the Cossipur Horticultural Institution, Calcutta, &c.

প্রণীত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, "গ্রেট ইডিন প্রেস" হইতে
এস্, সি, বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২০।

মূল্য ||০ আনা মাত্র

দে, এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৭।১, বিডন রো, কলিকাতা।

ভূমিকা।

মৎপ্রণীত 'কৃষিক্ষেত্র' 'সব্‌জীবাগ', 'ফলকর' প্রভৃতি পুস্তকে সার-সম্বন্ধে অল্পাধিক লিখিত হইয়াছে কিন্তু সেই সকল বিশেষ বিশেষ পুস্তকের জন্য যে-টুকু প্রয়োজন বোধ করিয়াছি তাহাতে সেইটুকুই আলোচিত হইয়াছে। সাধারণভাবে ও বিস্তৃতরূপে মাত্র সার-সম্বন্ধে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকের বিশেষ অভাব উপলব্ধি হওয়ায় 'উদ্ভিদখাদ্য' রচিত ও প্রচারিত হইল। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জিবনী প্রভৃতি সাপ্তাহিক এবং কৃষক, কৃষি-সম্পদ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বহু বৎসর হইতে কৃষিপ্রসঙ্গের বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে সার বিষয়ক কয়েকটী প্রস্তাবও ছিল। তাহাদিগের মধ্যে কয়েকটী প্রবন্ধ পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।

চাষ-আবাদ বা বাগান-বাগিচা করিয়া সাফল্যলাভ করিতে হইলে একাগ্রমনে উদ্ভিদের পরিচর্য্যা করা প্রয়োজন। কাগজে-কলমে যত কৃষিচর্চ্চা করা যায় তৎসমুদায় যে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য তাহা বলা বাহুল্য। এইটুকু যাঁহারা বুঝিতে পারেন না তাঁহারা আমাদিগের কৃষিবিষয়ক লেখাপড়া আলোচনা চর্চ্চা প্রভৃতি দেখিয়া উপহাস করিতে ত্রুটি করেন না। এই শ্রেণীর ভ্রম দূর করিবার জন্য আমি এই কৈফিয়ৎ দিলাম। মোট কথা, পুস্তকপত্রিকাদি চাষীদিগের জন্য নহে, শিক্ষিত ও গৃহস্থদিগের জন্য। ইঁহাদিগের অল্পাধিক বিদ্যা আছে, আর্থিক সামর্থ আছে অথচ যথোপযুক্ত কৃষিবিষয়ক জ্ঞান না থাকায় ইচ্ছা সত্ত্বেও কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারেন না।

ইঁহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। কার্য্যে সাফল্যলাভের আশাতেই মানুষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাইলে নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়েন, আর্থিক ক্ষতিতে বিপর্য্যস্ত হয়েন; তাহা ব্যতীত অনর্থক বহু সময়ও তাঁহাদিগের নষ্ট হয়।

হৃষ্টচিত্তে উৎসাহভরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। যাহাতে যে কাজটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে সেজন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। যে পরিমাণে অবহেলা করিব, সেই পরিমাণে কার্য্য পণ্ড হইবে। চাষ-আবাদ বা বাগবাগিচা করিয়া অভিষ্টসিদ্ধ হইতে হইলে যেরূপ উত্তম কর্ষণ, উত্তম বীজ প্রভৃতির প্রয়োজন, সেইরূপ উদ্ভিদের প্রতিপালনার্থ যথেষ্ট সার, পুষ্টিকর সার—সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হইবে। বিনা সারে কার্য্য করিতে আমি পরামর্শ দিই না। পুষ্টিকর খাদ্য পানভোজনে মানুষ হইতে তাবৎ জীবজন্তু যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে, বাড়ন্ত হয়, বলিষ্ঠ, পরিপুষ্ট ও হৃষ্টচিত্ত হয়, ফলতঃ তজ্জাত সন্তানসন্ততিগণও তাদৃশ হয়, সেইরূপ উদ্ভিদগণও যথেষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য, সার পাইলে সমধিক ও ত্বরিত বৃদ্ধিশীল হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ফলপুষ্পাদি প্রদান করিয়া আমাদিগের অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও উদ্‌গ্রীবতার পূর্ণ মাত্রায় প্রতিদান করিয়া থাকে।

পুস্তকমধ্যে অনেক রাসায়নিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও সাধ্যমত বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, সে বিষয়ে কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা,
বৈশাখ, সন ১৩২০ সাল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

উদ্ভিদখাদ্য।

সার কি ?—গাছ পালাকে উত্তেজিত, বৃদ্ধিশীল বা সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান করিবার জন্য, কখনও বা সমধিক ফলশালী করিবার জন্য, কিম্বা ফল-ফুলের আকার বা শস্যের গুণবত্তা বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষেত্রে সার দিবার ব্যবস্থা আছে। ক্ষেত্রে যে, সার প্রদান করা প্রয়োজন এবং ক্ষেত্রে সার প্রদানের ফলে ফসলের যে উপকার দর্শিয়া থাকে তাহা আমাদিগের কৃষকগণ বিশেষ অবগত আছে। তাহা ব্যতীত, প্রায় সকল কৃষকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে কোন-না-কোন সার প্রদান করিয়া থাকে। তাহা হইলেও এতৎসম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আছে, কৃষকেরও অনেক শিক্ষণীয় আছে। প্রথমেই আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে—সার কি ? ক্ষেত্রেজ, জলজ, প্রাণীজ, বা খনিজ,—যে কোন সামগ্রী দ্বারা উদ্ভিদের ফলনে বা ফুলনে, দেহের গঠনে বা দেহের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে উপকার দর্শিয়া থাকে, তাহাই সার নামে অভিহিত। উক্ত পদার্থ সমূহের মধ্যে বহুমূল্য বা দুষ্প্রাপ্য বা দুর্লভ সামগ্রীই যে প্রকৃষ্ট সার—তাহা নহে। প্রায় প্রত্যেক পদার্থই নানা উপকরণে গঠিত। অতঃপর সেই সকল উপকরণের বিশেষত্ব অনুসারে সামগ্রী-বিশেষের বিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থ মধ্যে জৈবীক (Organic) পদার্থের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য দিকে খনিজ পদার্থ মধ্যে ধাতবীয় পদার্থের বিশেষত্ব বর্ত্তমান। উল্লিখিত দুই জাতীয় সামগ্রী

ব্যতীত আরও একটী বিশেষ ও অবশ্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে, তাহা বায়বীয় বা বাষ্পীয় পদার্থ (Gaseous substance) তথাপি কিন্তু এস্থলে একটী ব্যক্তব্য আছে যে, শেষোক্ত পদার্থ বাষ্পীয় হইলেও, প্রকৃতই যে, তাহা স্থূল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র তাহা নহে, তবে উহা এতই লঘু পদার্থে সংগঠিত যে, বিমুক্ত অবস্থায় বায়ুমণ্ডল ব্যতীত কুত্রাপি থাকিতে পারে না। জলজান (Hydrogen), অম্লজান (Oxygen), যবক্ষারজান (Nitrogen) প্রভৃতি সামগ্রী বাষ্পীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য এবং স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ুমণ্ডলেও ইহা-দিগের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। তাবৎ স্থূল ও লঘু পদার্থের প্রকৃত অবস্থাই এই, কারণ যে কোন পদার্থ অসম্ভবনীয় লঘুত্বে পরিণত হইলেও পরিমাণানুসারে তাহার গুরুত্ব তিরোহিত হয় না। পদার্থ মাত্রই পরমাণুর সমাবেশ-ফল। ইংরাজি ভাষায় উক্ত পরমাণুদিগকে atoms কহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, atom নামক পরমাণুও বিভাজ্য এবং তাহাদিগেরও সূক্ষ্মভাগ আছে, তাহা Electricity নামে অভিহিত। বিজলী একটী সূক্ষ্মতম পদার্থের সমাবেশ ফলমাত্র এবং সেই বিজলী বা Electricity সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইলে কিম্বা উহার অন্তর্গত পদার্থরাশি বিমুক্তি লাভ করতঃ স্বাতন্ত্র প্রাপ্ত হইলে, অগণিত কণায় পরিণত হয়। উক্ত কণাদিগকে বৈদ্যুতিক-কণা বা Electrons কহে। এতজ্জাতীয় যে সূক্ষ্মতর পরমাণুর আবিষ্কার হইয়াছে তাহার নাম ইথার (Ether)। আজ পর্য্যন্ত ইহার অধিক আর আবিষ্কার হয় নাই, কালে যে তাহা হইবে না তাহা কেমন করিয়া বলিব? এতদ্দ্বারা

আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, তাবৎ পদার্থই সেই সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক কণা বা বৈদ্যুতিক পদার্থের ক্রম-বিকাশ মাত্র।* যাহা হউক, ক্রম-বিকাশ হইলেও, সেই অনণুমেয় চরমসূক্ষ্ম কণা-রাশির একেবারে বিলোপ নাই, কারণ ইথ'র যতই সূক্ষ্মতায় পরিণত হউক, তাহার আকার ও অবয়ব থাকেই।

সার ও শক্তি।—পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, সার, ঘন (Solid) হউক বা লঘু হউক, তাহাতে বড় আসিয়া যায় না। ক্ষেত্রে সার প্রদত্ত হইলে উদ্ভিদ-শরীরে যে তাহার কার্য্যকারিতা প্রতিফলিত হয়, তাহা সারের গুণ, কি তৎপশ্চান্নিহিত কোন অলৌকিক শক্তির গুণ? কথাটী নিতান্ত গুরুতর এবং অনেকে ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে না পারেন, কারণ আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে অনেকেই প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) পক্ষাবলম্বী। আমরা তাঁহাদিগের সহিত তর্ক-বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহি—উহা আমা-দিগের বিষয়বহির্ভূত। কিন্তু, আমরা জানি ও বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক পরমাণুর ও প্রত্যেক কণার সহিত অসীম শক্তি নিবদ্ধ এবং ইহাও বিশ্বাস করি যে, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যতদিন কণাদিগের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন সে শক্তিও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সাধারণতঃ ইহাই আমরা বুঝিয়া থাকি যে, কতকগুলি বিশেষ সামগ্রী দ্রবীভূত বা বিগলিত হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেই তাহা,

* মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় তদীয় "জীবনতত্ত্ব ও তাহার অভিব্যক্তি" নামক বহু গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে উক্ত বিষয়ের সুন্দর আলোচনা করিয়া ক্রমবিকাশ-বাদ বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

সার নামক পদার্থে পরিণত হয়। স্থূলতঃ ইহাই ঠিক, কিন্তু আরও কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে বুঝিতে বাকী থাকে না যে, সেই পরমাণুজাত শক্তিসমবায়ফলে উদ্ভিদশরীরে যে ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সারের ক্রিয়া বলিয়া জানিতে হইবে। পরমাণুসম্ভূত শক্তিই আমরা চাহি। পরমাণুর পশ্চাতে সে শক্তি না থাকিলে কিম্বা ভৌতিক ক্রিয়াবলে সেই শক্তির বিকাশ না হইলে, সার যতই মূল্যবান হউক, যতই সারবান হউক, তদ্দ্বারা কোন প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় না। যাহা হউক, সার ও তদীয় শক্তি একত্রে এমনই অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ যে, একক্ে ছাড়িলে অপরকে পাওয়া যায় না। সারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই তদন্তর্গত শক্তিরও আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। আবার যদি মাত্র শক্তির অন্বেষণ করি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদিগকে সারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। শক্তি, আধার বিহনে থাকিতে পারে না, আধারও শূন্য থাকিতে পারে না বলিয়া শক্তিকে আহরণ করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ, বিশেষ সারের বিশেষ বিশেষ শক্তি আছে, কারণ উপাদানের ভিন্নতা ও পরিমাণানুপাত অনুসারে প্রত্যেক সারের শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। এই জন্য, কোন সার প্রদানের ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধিশীলতা ত্বরিত হয়, আবার কোন সারের গুণে ফল-ফুল অধিক হয় কিম্বা ফল-ফুল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সমুজ্জল বা মধুর হয়। সারের গুণে এইরূপ অনেক কার্য্য হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ ও ভূমি।—সাধারণতঃ ভূমিই উদ্ভিদের আবাস স্থান, ভূমির সাহায্যেই উদ্ভিদ নিশ্চলভাবে নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া উদ্ভিদজীবনের তাবৎ ক্রিয়া সমাধান করিয়া থাকে। ইহাই

হইল সাধারণ নিয়ম। তাহা ব্যতীত, জলে ও বায়ুমণ্ডলে বহু জাতীয় উদ্ভিদ বাস করিয়া থাকে। জলে যেরূপ নানাবিধ জীব বাস করে, শূন্যমার্গেও সেইরূপ অগণিত জীব নিরন্তর ভাসমান অবস্থায় থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করে। উদ্ভিজ্জগতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, তবে প্রত্যেক জাতীয় জীব বা উদ্ভিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। ভূমিজ উদ্ভিদ ভূমিতে বাস করে এবং ভূগর্ভ হইতে তাবৎ আহার্য্য আহরণ করিয়া জীবিত থাকে। এতদ্ব্যতীত বায়ুমণ্ডল হইতে শ্বাস প্রশ্বাসের নিমিত্ত বাষ্পীয় পদার্থ পরিশোষণ করে। এই হেতু উদ্ভিদের জন্য ভূমি ও আকাশ—এতদুভয়েরই প্রয়োজন। ভূগর্ভ মধ্যে স্বভাবতঃ বহুবিধ উদ্ভিদখাদ্যের উপযোগী পদার্থ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। এই জন্য, যে কোন উদ্ভিদ হউক, ক্ষেত্রে রোপণ করিলে তাহারা আপনাপন খাদ্যাদি ভূগর্ভ হইতে আহরণ করিতে সমর্থ। ভূগর্ভ মধ্যে যে সমূহ পরিমাণে উদ্ভিদখাদ্য বিদ্যমান তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।* কিন্তু তাহা হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্থান নির্ব্বিশেষে সকল স্থানে তাবৎ প্রকার উদ্ভিদখাদ্য প্রয়োজনমত থাকে না এবং তাহারও কারণ আছে। ভূগর্ভে যে সকল উদ্ভিদখাদ্য মজুত থাকে, তাহা কেহ কোন উদ্ভিদ বিশেষের জন্য রাখিয়া দেয় নাই, উহা আপনা হইতেই সঞ্চিত হইয়া আছে এবং কালপ্রভাবে অল্পাধিক জীর্ণ হইয়াও থাকে।† এই জন্য

* মৎ প্রণীত 'ভূমিকর্ষণ' নামক পুস্তকে উক্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

† 'মৃত্তিকাতত্ত্ব' দেখুন।

আমরা দেখিতে পাই যে, অরণ্যজাত উদ্ভিদনিচয় কিম্বা পতিত স্থানের স্বভাবজাত গাছপালাগণ কোন স্থানে মনোরম্য আকার ধারণ করে, আবার কোথাও বা অকিঞ্চিৎকর বা নগণ্যভাবে অবস্থান করে। ঈদৃশ পার্থক্যের দুইটী কারণ পরিলক্ষিত হয়, ১ম,—স্থান বিশেষের উপযোগীতানুসারে উদ্ভিদের নির্ব্বাচন হয় না; ২য়,—উদ্ভিদ বিশেষের বিশেষত্বানুসারে ভূগর্ভমধ্যে তাহাদিগের প্রয়োজনীয় তাবৎ খাদ্য বিদ্যমান থাকে না, কিম্বা খাদ্যান্তর্গত উপাদানের মধ্যে অনুপাতের তারতম্য থাকে। জীবদিগের মধ্যে খাদ্যবিভাগ আছে। কোন জীব মাংসাশী, কোন জীব নিরামিষাশী, আবার অনেক জীবজন্তু উভয়বিধ খাদ্যের প্রয়াসী। অতঃপর ইহাও দেখা যায়, কোন কোন গাছপালা বা তরিতরকারি অথবা মৎস্য মাংস, জাতিবিশেষ বা জীববিশেষের উপযোগী। কেবল ইহাতেই শেষ নহে। কোন খাদ্য এক জীবের আহার্য্য কিন্তু অপর জীবের পক্ষে তাহা নহে বরং অনেক সময় হয়ত অনিষ্টকর হইয়া থাকে। উদ্ভিদের আহার্য্য সম্বন্ধে আমরা এতটা খবর রাখি না, এই জন্য অনেক সময়ে আমাদিগের কৃষিবিষয়ক চেষ্টা বা যত্ন ব্যর্থ হইয়া থাকে। এই সকল কারণবশতঃ আমাদিগকে যথা উদ্ভিদে যথাসময়ে যথা পরিমাণে যথোপযুক্ত আহার্য্যের ব্যবস্থা না করিলে ক্ষতি হয়। হটকারিতা বা অবিমৃষ্যতাসহকারে সার ব্যবহৃত হইলে মনোমত ফল পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া সার ব্যবহার করিলে আমরা দুইটী প্রধান বিষয়ে বিশেষ লাভবান হই, ১ম—অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে কার্য্য সমাধা করিতে পারি; ২য়—ফলনের প্রাচুর্য্য হয়, ফলমূলের আকার ও গুণ বৃদ্ধি হয়।

উদ্ভিদখাদ্য কি? আমরা প্রাচীনকাল হইতে জানিয়া আসিতেছি যে, ক্ষেত্রে সার প্রদত্ত হইয়া থাকে কিন্তু এক্ষণে জ্ঞাতব্য এই যে, আমরা ভূমিকে সার দিই, না উদ্ভিদকে বা উদ্ভিদের জন্য দিই? এই সহজ কথাটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিলে সার-সমস্যা প্রতিপাদিত হইতে বিলম্ব থাকে না। ক্ষেত্রে সার প্রয়োগের ফলে উদ্ভিদের ও সেই সঙ্গে তদীয় ফলফুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি তাহাই স্থির হইল, তাহা হইলে সারকে অন্য কিছু মনে না করিয়া উদ্ভিদখাদ্য বলিয়াই জানিতে হইবে। ক্ষেত্রে সার প্রদান করি—উদ্ভিদের জন্য। উদ্ভিদগণ যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন ভূমি হইতে আহার্য্য পরিশোষণ করে। সেই জন্য, কোন দিন তাহাদিগের আহার্য্যের অভাব-অকুলান না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসময়ে যথাপরিমাণে যথাযোগ্য খোরাক সরবরাহ করিতে হইবে। ভূগর্ভে যে কিছু উদ্ভিদখাদ্য বর্ত্তমান থাকে অথবা আমরা যে কিছু সার ক্ষেত্রে প্রদান করি, উদ্ভিদগণ তাহা হইতে আপনাপন অভিরুচি ও প্রয়োজন মত আহরণ করতঃ জীবিত থাকে, বৃদ্ধি পায়, অবশেষে ফল-পুষ্পাদি প্রদান করিয়া থাকে। অতঃপর ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, উদ্ভিদগণ ভূমি হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করে তৎসমুদায়ই রূপান্তরিত করিয়া অল্লাধিক কাল মধ্যে প্রত্যর্পণ করে।

উদ্ভিদ জীব কি না? মূলদ্বারা উদ্ভিদগণ আহার করে এবং জীবিত পত্রস্থিত কূপরাশি (Stomata or Pores) দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সমাধা করে। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদস্থ কোমল হরিদংশ দ্বারাও বায়ুমাণ্ডলিক পদার্থ আহরিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের জীবনধারণ প্রণালী জীবাপেক্ষা কোন ক্রমে হীন নহে।

জীবণধারণ করিতে হইলে জীবেরও যে যে সামগ্রীর বা যে যে অবস্থার প্রয়োজন, উদ্ভিদগণের পক্ষেও তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। উদ্ভিদেরও জীবের ন্যায় ব্যাধি আছে, সুখ দুঃখ আছে। এই সকল কারণে উদ্ভিদকে জীব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? জীব ও উদ্ভিদ মধ্যে মাত্র একস্থলে বিচ্ছেদ,—উক্ত বিচ্ছেদস্থল—চলচ্ছক্তি। এই কারণে জীব জগতের সর্ব্বনিম্ন সোপানে উদ্ভিদের স্থান। সৃষ্টি মধ্যে মনুষ্য হইতে যত নিম্ন শ্রেণীতে অবরোহণ করা যায় ততই দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক শ্রেণীতে কিছু-না-কিছু শক্তির হ্রাস হইয়াছে। সকল জীবের সাধারণতা—চলচ্ছক্তি, কিন্তু তাহাও সকল জীব মধ্যে সমশক্তিশীল নহে। দ্বিপদের একরূপ, চতুষ্পদের অন্যরূপ, পক্ষীপতঙ্গদিগের একরূপ, আবার কীটদিগের অন্যরূপ। অনেক কীট আছে তাহাদিগের গতি নিতান্ত মন্থর এবং আমাদিগের মনে হয় যে, সেই মন্থরতার পূর্ব্বাবস্থা—নিশ্চলতা। সেই চলচ্ছক্তিবিহীন জীবের নাম,—উদ্ভিদ। বাল্যকালে পুস্তকাদি পাঠে জানিতাম যে, সৃষ্টিমধ্যে তিনটী বিশেষ স্তর আছে, (১) চেতন, (২) অচেতন, ও (৩) উদ্ভিদ, কিন্তু আধুনিক মত তাহা নহে। অধুনাতন ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, সৃষ্টির কোন পদার্থই চেতনাবিহীন নহে, সকল পদার্থই—বৃহত্তম জীব ও উদ্ভিদ হইতে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত সকল পদার্থই চৈতন্য সংযুক্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উদ্ভিদের জীবন আছে, সুতরাং উদ্ভিদকে জীব নামে অভিহিত করিতেই হইবে। তবে, এই যে সুবৃহৎ জীবজগৎ, ইহাকে আমরা দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি, সে কেবল বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধার নিমিত্ত। যাহা হউক, উদ্ভিদের জীবন বা উদ্ভিদের কার্য্যপ্রণালী অত্র

বিষয়ের অন্তর্গত নহে, এবম্বিধায় তৎসম্বন্ধে এস্থলে কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, মাত্র উদ্ভিদের খাদ্য-কথাই এ পুস্তকের বিষয়ীভূত।

স্বাভাবিক খাদ্য।— উদ্ভিদ আহার করে এবং আহারচ্যুত হইলে ম্রিয়মাণ হয়, বিবর্ণ হয়, অল্পাধিক পত্রপল্লবহীন হয়, পরে অপরাপর জীবের ন্যায় মরিয়া যায়। আবার প্রিয়, পুষ্টিকর, প্রচুর খাদ্য পাইলে বৃদ্ধিশীল, পরিপুষ্ট ও মনোরম্য হয়, উপরন্তু সমূহ ফলপুষ্প প্রদানে সমর্থ হয়। প্রাণীজগতের সকলেই এ নিয়মের অধীন এবং তাহারা পর্য্যটনকরতঃ স্ব স্ব আহারীয় সংগ্রহ করিতে সমর্থ, এক স্থান হইতে না পাইলে অন্যস্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পারে, কোন খাদ্য রুচিকর না হইলে কিম্বা কোন খাদ্য অনুপযোগী হইলে তাহা বর্জ্জন করিয়া তৃপ্তিকর ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু উদ্ভিদগণের চলচ্ছক্তি না থাকায় স্থানান্তরে যাইতে পারে না, কাজেই সহজে ও নিকটে যাহা পায় তাহা মূলদ্বারা আহরণ করিয়া থাকে মাত্র। ভূগর্ভে স্বভাবতঃ যে কিছু উদ্ভিদখাদ্য থাকে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। উদ্ভিদের শৈশবাবস্থায় তদ্দ্বারা তাহার অভাব মোচন হইতে পারে কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধিসহকারে স্থানীয় খাদ্য সামগ্রী আহরণ করতঃ নিকটস্থ ভূমিকে ক্রমশঃ নিঃস্ব করিয়া ফেলে, অগত্যা তাহাদিগকে বহুমূল বিস্তার করিয়া বহুদূর হইতে আহারীয় সংগ্রহ করিতে হয়, তথাপি তাহাদিগের হয় ত সকল অভাব পূরণ হয় না, পরিমাণেও প্রচুর খাদ্যের হয় ত যোগাড় হইয়া উঠে না। এতদ্ব্যতীত এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া আহারীয় সংগ্রহ করিতে তাহা-

দিগের অনেক শক্তি বা উদ্যম ব্যয়িত হইয়া থাকে কিন্তু নিকটে ও সমূহ পরিমাণে পাইলে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, ফলতঃ সে উদ্যম নিজ নিজ শরীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বর্দ্ধন ও ফলন-ফুলনাদি কার্য্যের বিপুল সহায়তা করে। স্বভাবজাত উদ্ভিদগণ অনেকটা স্বাধীন, কারণ প্রথমতঃ তাহারা স্বভাবতঃ কষ্টসহ হইয়া থাকে, উপরন্তু প্রায় পরস্বাপহরক হইয়া থাকে। আবাদী উদ্ভিদমাত্রেই প্রায় উদ্যানক বা কৃষকের অল্পাধিক অধীনে থাকে, তাহা ব্যতীত ইহাদের প্রকৃতিও অনেকটা কোমল, এজন্য স্বভাবজাত বা অরণ্যজাত উদ্ভিদগণের ন্যায় তাদৃশ কষ্টসহ (Hardy) হইতে পারে না, বরং শেষোক্তগণের পীড়নে অনেক সময় ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় বা মরিয়া যায়। অরণ্যজাত উদ্ভিদগণ ভূমি হইতে যাহা কিছু আহরণ করে তাহার অধিকাংশই পত্রপল্লব ফলপুষ্প প্রভৃতিরূপে স্খলিত হইয়া পুনরায় ভূমিতে আসিয়া স্থান পায়, অতঃপর তৎসমুদায় বিগলিত হইয়া তাহাদিগেরই আবার নূতন খাদ্যে পরিণত হয়। আবাদী উদ্ভিদের ঐ সকল অংশ প্রায় আহরিত হইয়া ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া যায়, ফলতঃ ভূমির সারাংশ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপে আবাদী ক্ষেত্র হইতে প্রতিবৎসর বহু পরিমাণ জৈব ও অজৈব (Organic and Inorganic) পদার্থ অন্তর্হিত হইতেছে বলিয়া পুরাতন ক্ষেত্র ক্রমশঃ হীনশক্তি হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু ধরিত্রীগর্ভ নিতান্ত পক্ষে নিঃস্ব হয় না বলিয়া বিনাসারেও গাছপালা জন্মে কিন্তু পূর্ব্ববৎ তেজাল বা ফলবন্ত হইতে পারে না। দীর্ঘজীবী মহীরুহগণ ভূগর্ভ হইতে বহুদিন বা বহুকাল পর্য্যন্ত খাদ্য আহরণ করিয়া থাকে কিন্তু এতদ্দ্বারা কালক্রমে তাহা-

দিগের খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে, অনেকে এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন। অনেক পুরাতন আম্র বা কাটালবৃক্ষ শতাধিক বৎসর-কাল জীবিত থাকে এবং ফলপ্রদান করে কিন্তু এতকাল ধরিয়া কে তাহাদিগের আহারীয় যোগায়? বরং লোকালয়ের সন্নিহিত-গাছ হইলে স্থানীয় অধিবাসীগণ তজ্জাত ফলগুলি, অনেকস্থলে স্খলিত পত্রপল্লবগুলিও, প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে ক্রটী করে না। ফলকর বাগানের ফলসমূহ ত সংগৃহিত হয়ই, স্খলিত পত্রগুলিও বিক্রিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র হইতে ফসল সংগৃহীত হইলে ক্ষেত্রস্বামী না হইলেও, স্থানীয় গরীব দুঃখী লোকেরা ফসলের পরিত্যক্ত গোড়াগুলিকে যত্নসহকারে সংগ্রহকরতঃ লইয়া গিয়া জ্বালানীকার্য্যে ব্যবহার করে। ঈদৃশ ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা কারণে আবাদী বাগবাগিচা বা জমি-জমা দিন দিন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অগণ্য অরণ্যানীজাত উদ্ভিদগণের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, তাহাদিগের অঙ্গচ্যুত কোন সামগ্রী প্রায় স্থানান্তরিত হইতে পায় না। অতঃপর ইহারা ক্রমাগত মূলপ্রসারণ করতঃ বহুদূর ও বহু নিম্নদেশ হইতে বহু বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া খাদ্য সংগ্রহে সমর্থ। অনন্তর পূর্ব্বাহরিত খাদ্য দ্রব্যজাত পত্রপুষ্পাদি ভূপতিত হইয়া স্থানীয় মাটির অঙ্গ পুষ্ট করিয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ফলতঃ তাহাদিগের কোন কালে আহারীয়ের অভাব ত হয়ই না বরং তদ্দ্বারা সন্নিকটস্থ অপরাপর উদ্ভিদের উপকার দর্শিয়া থাকে।

স্বভাবজাত ও পালিত উদ্ভিদ।—স্বভাবজাত সকল উদ্ভিদ যে, সুপুষ্ট ও বৃদ্ধিশীল হয় কিম্বা সমূহ পরিমাণে অথবা উৎকৃষ্ট ফলপুষ্প প্রদানে সমর্থ তাহা নহে, কারণ কি তাহা

সংক্ষেপে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তথাপি আরও কিছু বলিবার আছে। সকল অবস্থায় বা সকল মৃত্তিকায় উদ্ভিদগণ স্ব স্ব আহারোপযোগী প্রচুর বা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। সকল মাটির উপাদান সমান নহে,—কি প্রকারে বা কি পরিমাণে। এই বিশেষ কারণে মৃত্তিকা নির্ব্বিশেষে সকল স্থানে সকল উদ্ভিদ সমভাবে থাকিতে পারে না। অরণ্যবাসী ও গৃহপালিত পশুপক্ষী মধ্যে দৈহিক ও স্বাস্থ্যিক অনেক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বনবাসী পশুগণ সকল সময়ে যথাযোগ্য আহার পায় না, অনেক দিন তাহাদিগকে অল্পাহারে বা অনশনে থাকিতে হয়, কিন্তু গৃহপালিতগণ কিম্বা মনুষ্য সমাজ-সংশ্লিষ্ট পশুগণ তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পায়। অতঃপর বন্য জীবগণ যাহা কখনও চক্ষে দেখে নাই, ঈদৃশ অনেক তৃপ্তিকর ও পুষ্টিকর খাদ্য ইহারা নিত্য খাইতে পায়। তাহা ব্যতীত, যত্ন একটী বিশেষ জিনিস, বহুমূল্য ও বহু পুষ্টিকর সামগ্রী হইতেও স্পৃহণীয় এবং শরীরমনের স্বচ্ছন্দতা বিধায়ক। এই জন্য শেষোক্ত পশুগণের স্বাস্থ্য নীরোগ হয়, শরীর বর্দ্ধিষ্ট ও বলিষ্ট হয়, উপরন্তু, তাহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হয়। আরণ্যক ও পালিত পশুমধ্যে যে যে কারণে প্রভেদ দৃষ্টি গোচর হয়, স্বভাবজাত বা অরণ্যজাত ও পালিত উদ্ভিদ-মধ্যে সেই সেই বা তদনুরূপ কারণে উভয়ের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, অরণ্য হইতে সংগৃহীত কোন উদ্ভিদকে ৩।৪ বংশ পরম্পরা কৃত্রিম প্রণালীতে লালনপালন করিলে তাহার আকৃতি হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত এতই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, তাহাকে আর তাহার পুরুষদিগের সহিত সমজাতীয় মনে করিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়। আমরা যত ফলফুল, তরিতরকারী বা

বাণিজ্য-ফসলের আবাদ করিয়া থাকি তৎসমুদায়ই পালিত-উদ্ভিদ মধ্যে পরিগণিত। পালিত-উদ্ভিদ হইলে তাহারা যথা-স্থানে রোপিত হয়, যথাযোগ্য খাদ্য পায় ইত্যাদি অন্যান্য আনু-সঙ্গিক কারণে তাহাদিগের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং এই প্রকারে তাবৎ উদ্ভিদের উৎকর্ষতা সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তথায় তাঁহারা অনেক পরিচিত উদ্ভিদ দেখিয়া থাকিবেন কিন্তু সেই উদ্ভিদ্দিগকে মনুষ্যসমাজসংশ্লিষ্ট প্রতিপালিত সমসাময়িক উদ্ভিদ-গণের সহিত তুলনা করিলে এতদুভয় মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যাইবে। আমাদিগের বাগ-বাগিচায় যে সকল ফুলগাছ দেখি, তাহার আকার ও প্রকৃতি এবং তজ্জাত ফলের গড়ন, আস্বাদ প্রভৃতি একরূপ, কিন্তু অরণ্য মধ্যে যে সকল ফুলগাছ পুরুষানু-ক্রমে আপনা হইতে জন্মিয়া আসিতেছে তাহাদিগের আকার, তাহাদিগের বৃদ্ধি, তজ্জাত ফল এবং তাহার স্বাদ অন্যরূপ এবং নিকৃষ্ট। আসাম, দারজিলিং বা অপর শৈলপ্রদেশে স্বভাবজাত গোলাপ গাছ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সেই গোলাপ গাছে ও পালিতগোলাপ গাছে কত প্রভেদ! খাদ্যের বিভিন্নতা ও পরি-চর্য্যার বিশেষত্ব হেতু কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এতদ্ব্যতীত, যৌননির্ব্বাচন প্রণালী (Hybrydization) দ্বারাও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তবে উক্ত বিষয়টী আমাদিগের বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য নহে।

যাহা হউক, আবাদ করিয়া লাভবান হইতে হইলে যে কয়টী জিনিষের প্রয়োজন, উদ্ভিদের যথাযোগ্য খাদ্য তাহার অন্যতম। কোন্ কোন জিনিসের সহিত কোন্ উদ্ভিদের বিশেষ সম্বন্ধ, কোন্

সার প্রদান করিলে কোন্ উদ্ভিদ বিশেষ ফলবতী হয়, কোন্ সার দ্বারা উদ্ভিদ বৃদ্ধিশীল হয়, কোন্ সার প্রদত্ত হইলে ফলফুলের গুণ-বত্তার পরিবৃদ্ধি হয়, তাহা বিশেষ পরিজ্ঞাত থাকা উচিত এবং তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়।

সার কাহাকে দিই ?—এক্ষণে আমরা বুঝিয়াছি যে, উদ্ভিদ—জীব মধ্যে পরিগণিত। উদ্ভিদের চৈতন্য আছে, উদ্ভিদ আহার করে এবং যথোচিত আহার না পাইলে শীর্ণ হয়,—ফলফুল প্রদানে অশক্ত হয়। এতদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, খাদ্য সামগ্রীর তারতম্যে উদ্ভিদের আবয়বিক পরিবর্ত্তন যেরূপ অবশ্য-ম্ভাবী, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হওয়াও সেইরূপ সুনিশ্চিত। অতএব খাদ্যের উপরেই তাহার ইষ্টানিষ্ট সমুদায় নির্ভর করিতেছে। সার যখন উদ্ভিদের খাদ্য, তখন জমিতে সার সংযোজিত করা আর উদ্ভিদকে খাইতে দেওয়া, একই কথা। উদ্ভিদহীন ক্ষেত্রে সার প্রয়োগে কোন লাভ নাই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদকেই আমরা সার দিয়া থাকি, মাটিকে বা জমিতে নহে, তবে আমাদিগের ন্যায় উদ্ভিদ বেচারির ঘর-বাড়ী নাই, ভূমি তাহার ঘরবাড়ী, ভূমিই তাহার ভাণ্ডার, রন্ধনশালা, আর নহে কি ? উদ্ভিদকে যদি ভূমি হইতে খাদ্য আহরণ করিতে না দিই, তবে জমিতে সার দিয়া ফল কি ? উদ্ভিদ কখন আহার করে, কিরূপে আহার করে, তাহা আমরা আজও অবগত নহি, তবে এই মাত্র সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি যে, মূলদ্বারা মাটি হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া থাকে, সুতরাং ভূমি, উদ্ভিদের খাদ্যদ্রব্য রক্ষণের আধারমাত্র কিন্তু সেই আধারকে জগদীশ্বর এরূপ কৌশলসহকারে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে যে কোন খাদ্য, যে কোন

অবস্থায় স্থাপিত হউক, কালবশে তাহা বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইয়া উঠে এবং উদ্ভিদগণ তাহাই প্রয়োজনমত আহরণ করে, অবশিষ্টাংশ ভূগর্ভমধ্যে ভাবী আহরণের নিমিত্ত সঞ্চিত থাকে। প্রতিক্ষণ আমরা উহাদিগের খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারি না বলিয়া সময়ে সময়ে ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে সার দিয়া রাখি।

—০—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুখ্য ও গৌণ সার।—উদ্ভিদের খাদ্যার্থে যে সকল সামগ্রী ক্ষেত্রে সংযোজিত করা যায় তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ, অপরগুলি অসাক্ষাৎ বা গৌণভাবে উদ্ভিদ শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহা সাক্ষাৎ সার বা direct food হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা উদ্ভিদগণ সগুই আহরণ করিতে সমর্থ, প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ-সার তন্মধ্যে প্রধান। এই শ্রেণীর সার সহজেই বিগলিত হইয়া থাকে এবং সেই জাতীয় সার প্রকৃতই তাহা-দিগের খাদ্য। অপর জাতীয় সার, যাহাদিগকে আমরা পরোক্ষ বা গৌণ সার মধ্যে পরিগণিত করিয়াছি তাহারা ভূগর্ভস্থ বা সার-মধ্যস্থ পদার্থরাশিকে বিগলিত করিয়া উদ্ভিদগণের আহরণোপযোগী করিয়া দেয়, এজন্য এই শ্রেণীর সারকে গৌণ বা indirect food কহে। ইহারা অপর গলনীয় পদার্থের সহিত সম্মিলিত না হইলে তদ্দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। এই শ্রেণীর সারমধ্যে সোডা, লবণ প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে পারা যায়। দ্রাবকতা ইহাদিগের

বিশেষ গুণ। এতজ্জাতীয় পদার্থরাশি মধ্যে কোন উদ্ভিদকে রোপণ করিলে উদ্ভিদের ত কোন উপকার হয়ই না, বরং, তৎ-সান্নিধ্যহেতু উহা অচিরে মরিয়া যায় কারণ উদ্ভিদের মূলগণ তাহার সহযোগে জারিত হইয়া পড়ে। অতঃপর সেই পদার্থের তীব্রতা উদ্ভিদ-শরীরে রসের সহিত প্রবাহিত হইয়া তাবৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিষময় করিয়া দেয়, এবং সেই বিষময় রস যত দূর প্রবাহিত হয়, উদ্ভিদের ততদূরের অবয়ব জীর্ণ হইয়া পড়ে। কৃত্রিম -বা গৌণ সার ব্যবহার করিতে এই জন্য ইতস্ততঃ করিতে হয়। আরও দেখা যায়, গৌণ সারভূত পদার্থ যতই ক্ষীণ হউক, তাহার অল্পাধিক অংশ মাটিতে স্বভাবতঃ থাকিতে দেখা যায়। কেহ দিয়া না রাখিলেও প্রকারান্তরে তাহা ক্ষেত্রে গিয়া স্থান পায় এবং ভূমির প্রথম উৎপত্তিকাল হইতেই তাহা হইয়া আসিতেছে। কিরূপে ভূমির উৎপত্তি হয়, তাহা যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহাদিগকে একথা অধিক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই কিন্তু অপরিজ্ঞাত পাঠকগণের বিদিতার্থ সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। ভূমির প্রধান উপকরণ—শৈলচূর্ণ। যে প্রকার শৈলকণাসমূহ গিরিরাজির অঙ্গস্খলিত হইয়া ভূমি উৎপন্ন করে তাহারাই ভূমির ভিত্তি বা বেসিস্ (Basis)। জল-প্রবাহে সেই সকল চূর্ণ নিম্নদেশে আসিবার কালে অপরাপর কত দেশ বিধৌত করিয়া আসে এবং কত দেশের ময়লা জল আসিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হয়, নানা উদ্ভিদাদির পরিণামা-বশিষ্ট তাহার সহিত সংযোজিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই মলিন ঘোলা জলে নানাবিধ পদার্থ ভাসমান থাকে। তৎসমুদয় চর, সৈকত, ক্ষেত-খামার বা খানা-

ডোবায় গিয়া স্থান পায়। এই সকল কারণে ভূগর্ভ মধ্যে বহুবিধ পদার্থের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।* যাহাহউক এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, মৃত্তিকা মধ্যে স্বভাবতঃ কতকগুলি পদার্থ এইরূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে, আর এই সকল পদার্থ উদ্ভিদ-গণের—অপরাপর সামগ্রীর ন্যায়—অধিক পরিমাণে কাজে আসে না, মাটিতে সামান্য পরিমাণ থাকিলেই যথেষ্ট। এতদবস্থায় আবার তাহাতে তজ্জাতীয় পদার্থ সংযোজিত হইলে উদ্ভিদের ক্ষতি হইতে পারে কিম্বা অপ্রয়োজনবিধায় ক্ষেত্রে অনর্থক পতিত থাকে মাত্র। এ জাতীয় সার ব্যবহার করিতে হইলে অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে তাহা যথা স্থানে উল্লিখিত হইবে।

উপকরণ চতুষ্টয়।—উদ্ভিজ্জীবনের উপযোগী যে চারিটী প্রধান উপকরণ প্রায় সকল মাটিতেই দেখা যায়, তাহাদিগের মধ্যে 'হিউমস্' (Humus) একটী বিশেষ। উক্ত পদার্থটী জৈব-পদার্থসম্ভূত এবং অবয়বহীন। জৈব-পদার্থ—প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ-পদার্থজাত। জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদ মধ্যে হিউমস্ থাকে না কিন্তু উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট পদার্থ দ্রবীভূত হইলে তাহাতে হিউমসের আবির্ভাব হয়। তথাপি হিউমস্ যে ঠিক কি, তাহা এখনও নির্দ্দেশিত হয় নাই, তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, উদ্ভিজ্জ পদার্থ বিগলিত হইলে বিশ্লিষ্ট (Disintegrated) হইয়া পড়ে, তখন উহাতে হিউমসের অস্তিত্ব উদ্ভিদগণ উপলব্ধি করে। প্রকৃত-পক্ষে ইহাই উদ্ভিজ্জ-সার এবং এই অবস্থায় উদ্ভিজ্জ-পদার্থের পরিণতি হইলে তবেই উদ্ভিদগণ তাহা আহরণ করিতে সমর্থ

* মৎকৃত "মৃত্তিকা তত্ত্ব" নামক পুস্তকে এ বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

হয়। অনেকে কিন্তু মনে করেন যে, উদ্ভিজ্জ পদার্থই প্রকৃত হিউমস্, ইহা যে ভুল তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। অপরাপর তিনটী পদার্থ—ঘন বা অজৈব (Inorganic matters) পদার্থ—বালুকা, চূণ ও নানাধাতু (Mineral matters) উদ্ভিদগণের অবয়ব নির্ম্মিত হইবার উপকরণ। উদ্ভিজ্জ পদার্থ মধ্যে উক্ত তিনটী পদার্থ বিগুমান থাকে এবং তাহা এত সূক্ষ্মভাবে থাকে যে, তৎপরবর্ত্তী উদ্ভিদগণ অতি সহজেই আহরণ করিতে সমর্থ হয়। উদ্ভিজ্জাত স্থূলপদার্থ উদ্ভিদগণ এত সহজে আহরণ করিতে সমর্থ হয় এই জন্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ভিদগণ ইতঃপূর্ব্বে ভূমি হইতে তাহা আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে বিগলন-ফলে পুনরায় পরমাণুর অবস্থায় ভূমিতে স্থান পায়। সেই সকল পদার্থ ভূমিতে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন তাহারা তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে, উক্ত অবস্থাত্রয়ের নাম—স্থূলাবস্থা, সূক্ষ্মাবস্থা ও পরমাণু-অবস্থা। আবাদী-ক্ষেত্রের মাটিতে ভৌতিক ক্রিয়াযোগে তৎসমুদয় প্রতিক্ষণ স্থূল হইতে পরমাণু অবস্থায় যাইতেছে এবং শেষোক্ত অনমুভবনীয় পরমাণু-অবস্থায় পরিণত হইলে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হয় সুতরাং উদ্ভিদ মধ্যে যে সকল পদার্থ থাকে প্রায় তৎসমুদায়ই সহজে গলনীয়। উল্লিখিত কয়টী স্থূল পদার্থ ব্যতীত আরও অনেক-গুলি ধাতবীয় পদার্থ যে থাকে, তাহা "মৃত্তিকাতত্ত্ব" পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক, মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের যেরূপ প্রয়োজন, অজৈব পদার্থেরও সেইরূপ প্রয়োজন।

বাষ্পীয় পদার্থ।—পূর্ব্বোল্লিখিত কয়টী পদার্থ ব্যতীত

উদ্ভিদ-শরীর গঠনের জন্য আর চারিটী বিশেষ পদার্থের প্রয়োজন, যথা—জলজান (Hydrogen), অম্লজান (Oxygen), সোরাজান (Nitrogen) ও অঙ্গারজান (Carbon)। উক্ত কয়েটী পদার্থ উদ্ভিদগণ স্বকীয় হরিদংশ—পত্র, এবং কাণ্ড শাখাদির কোমল অংশ, দ্বারা পরিশোষণ করে। এই পরিশোষণ কার্য্যকে (Assimilation) কহে। এ স্থলে দুইটী মত আছে সোরাজান আহরণ সম্বন্ধে সাধারণ মত এই যে, উদ্ভিদগণ মাত্র ভূমি হইতে মূল দ্বারা ইহা আহরণ করে, কিন্তু ফরাসী পণ্ডিত ভিলী-সাহেব বলেন যে, উল্লিখিত উপায়ে উদ্ভিদগণ নাইট্রোজেন ত আহরণ করেই, তাহা ব্যতীত, পত্র দ্বারা বায়ুমণ্ডল হইতেও আহরণ করিয়া থাকে। ইহা যে তাঁহার অপ্রামাণিক কথা তাহা নহে সুতরাং আমরা ভিলী-সাহেবের কথাকে উপেক্ষা করিতে পারিনা। অনন্তর ইহা ইদানিং নিশ্চিত জানিয়াছি যে, কতকগুলি উদ্ভিদ,—মাত্র সীম্বিক জাতীর উদ্ভিদগণ (Leguminosaœ)—পত্র-কূপ দ্বারা সোরাজান আরহণ করিতে সমর্থ এবং করিয়া থাকে। এই জাতীয় উদ্ভিদের ঈদৃশ বিশেষ শক্তি আছে বলিয়া আজকাল নিঃস্ব ক্ষেত্রে নানাবিধ তজ্জাতীয় উদ্ভিদের আবাদ করিয়া ক্ষেত্রে সোরাজানের সংস্থান করিয়া দেওয়া হয়। আমাদিগের কৃষককুল ইহার মূলতত্ত্ব অবগত না থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহা করিয়া থাকে, কারণ ইহা প্রায় দেখা যায়, নিঃস্ব ক্ষেত্রে অথবা উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ধরিয়া একই ক্ষেত্রে নানা ফসলের আবাদের পর সে ক্ষেত্রে এক বৎসর অড়হরের কিম্বা ধঞ্চের আবাদ করে। ইহারা সীম্বিক জাতীয় উদ্ভিদ। এতদুপায়ে ক্ষেত্রের বিগত-শক্তির অনেকটা পুনরাবর্ত্তন হয়,

ক্ষেত্রে সার সংযোগ করিবার কাজ হয়। বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজান ব্যতীত অপর যে কয়টী পদার্থ—জলজান, অম্লজান ও অঙ্গারজান—উদ্ভিদগণ পত্র দ্বারা আহরণ করে, তাহারা উদ্ভিদের প্রকৃত খাদ্য মধ্যে গণ্য নহে, উহাদিগের দ্বারা উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয় এবং মূল দ্বারা আহরিত পদার্থসমূহ জীর্ণ হইয়া শর্করা (Sugar), শ্বেতসার (Starch), লালা (Protoplasm), পত্র-হরিৎ (Chlorophyl) প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। উপরে যে সকল সামগ্রীর নামোল্লেখ করা গেল তৎসমুদায় উদ্ভিদের খাদ্য নহে।

প্রকৃত খাদ্য।—জীবন ধারণার্থে উদ্ভিদগণ মূলদ্বারা যে সকল পদার্থ আহরণ করে তাহাই উহাদিগের প্রকৃত খাদ্য। সেই সকল খাদ্যের মধ্যে ফস্‌ফরিক য়্যাসিড্‌, পটাস্‌ ও নাইট্রোজেন বা সোরাজান—এই তিনটী প্রধান। অনেকে চূণকে চতুর্থ খাদ্য মধ্যে গণ্য করেন কিন্তু চূণ সম্বন্ধে আমাদিগের এখনও মতভেদ আছে। আমরা ইহাকে সাক্ষাৎ খাদ্য না মনে করিয়া গৌণ সামগ্রী মধ্যে স্থান দিয়া থাকি। চূণ,—দাহক, তীব্র ও কষায় এবং অনেক স্থলে মৃত্যুজনক পদার্থ। চূণের তীব্রতা হরণ করিয়া ব্যবহার করিলে মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, মৃত্তিকান্তর্গত অজীর্ণ পদার্থ সহজে বিগলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হয়। এতদ্ব্যতীত, মৃত্তিকার অনেক দোষ ক্ষালিত হয় বলিয়াও ক্ষেত্রে চূণ ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, এ বিষয় যথাস্থানে সম্যকরূপে আলোচনা করিব। প্রথম তিনটী সামগ্রী এক্ষণে আলোচ্য। উদ্ভিদগণের আহারের জন্য ক্ষেত্রে আমরা যে কোন সার সংযোজিত করি না কেন,

আমাদিগের মূল উদ্দেশ্য—মৃত্তিকা মধ্যে উল্লিখিত তিনটী অর্থাৎ ফস্‌ফরিক-য়্যাসিড্, পটাস্, ও সোরাজান নামক পদার্থের সমাবেশ করিয়া দেওয়া। উদ্ভিদবিশেষের প্রয়োজনানুসারে উক্ত তিনটী পদার্থ যথাপরিমাণে মাটিতে থাকা একান্ত প্রয়োজন। ইহাদিগের অল্পতায় বা অভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি বা ফলন-ফুলনের ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু বিশেষ অনুরাগ ও যত্নসহকারে মৃত্তিকার বর্ত্তমান অবস্থা, উদ্ভিদের খাদ্যবিশেষের প্রিয়তা বা উপযোগীতা ও তদানুসঙ্গিক বিষয় সকল বিবেচনা করিয়া বিশেষ বিশেষ সার পরিমাণমত দিতে পারিলে বাস্তবিক বড় উপকার হয়। সাধারণতঃ লোকে এ সকল কথা ভাবিয়া দেখে না। উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, কার্য্য-কারণ প্রভৃতির বিষয় না বিবেচনা করিয়া সার ব্যবহার করে। কোন্ উদ্ভিদে কোন্ সারের প্রয়োজন, কোন্ মাটিতে কি কি উদ্ভিদখাদ্যের, এবং সেই সেই খাদ্যের কি পরিমাণ অভাব আছে, তাহা যেরূপ লোকে ভাবিয়া দেখেনা, সেইরূপ সারের মধ্যে কি কি উদ্ভিদখাদ্যোপযোগী পদার্থ কি পরিমাণে অবস্থিত তাহাও বিচার করে না, কিন্তু এরূপ অবিমৃষ্যকারীতার ফল কি? ইহার অনিবার্য্য ফল—অর্থের অপচয়, সময় নষ্ট ও মানসিক ক্লেশ। যিনিই কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন বা উদ্যানকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারই এ সকল বিষয়ে অল্পাধিক জ্ঞান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। এ সকল বিষয়কে হতাদর বা উপেক্ষা করিয়া যিনি কৃতকার্য্য হইতে চাহেন তাঁহার আশা ভরসা অতি সুদূরপরাহত জানিতে হইবে—অনিশ্চিতও বটে।

সোরাজান (Nitrogen)।—বায়ুমণ্ডল ও ভূগর্ভ—

এতদুভয় স্থানেই প্রভূত পরিমাণে সোরাজান বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত, তাবৎ জীব ও উদ্ভিদ শরীরমধ্যে এবং তৎসমুদয়ের বিবর্জ্জিত-পদার্থরাশি মধ্যেও সোরাজান বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। এতৎ সমুদয়ের অন্তর্গত এবং ভূগর্ভস্থিত সোরাজান অপরাপর পদার্থের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া থাকে, বিশ্লেষণ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর বুঝিতে পারা যায়,—উদ্ভিদের মূলদেশে প্রদত্ত হইবার পর উদ্ভিদ-শরীরে তাহার কার্য্যকারীতা দেখিয়া।

বায়ুমণ্ডলের সোরাজান সীম্বিক উদ্ভিদ ব্যতীত অপর উদ্ভিদগণ আহরণ করিতে সক্ষম নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফরাসী পণ্ডিত ভিলী সাহেব ও তৎসমুদয় ব্যক্তিগণ সে কথা স্বীকার না করিয়া বলেন যে, সকল ক্ষেত্রজ উদ্ভিদই বায়ুমণ্ডল হইতে সমধিক পরিমাণে না হইলেও কতক পরিমাণে উহা আহরণ করিতে সমর্থ। ভূমিতে সোরাজানজনিত সার, গবাদি পশুশালার আবর্জ্জনা, খৈল, সোরা প্রভৃতি প্রদান করিলে হাতে-হাতে ফল পাওয়া যায়। তবে, ইহা স্বীকার্য্য যে, বায়ুমণ্ডলস্থ সোরাজান, বৃষ্টি সহযোগে ভূপতিত হইলে উদ্ভিদের বিশেষ উপকারে আইসে। সোরাজান দ্বারা জীব-উদ্ভিদ নির্ব্বিশেষে বিশেষ পরিপুষ্ট হয়, সুতরাং সকল জীব ও উদ্ভিদের পরিপুষ্টির নিমিত্ত উক্ত পদার্থ-বহুল সার বা খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। কি জীব, কি উদ্ভিদ,—সকলেরই শরীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমণে উক্ত পদার্থের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উদ্ভিদের ফল ফুল, পত্র পল্লব, এবং জীবগণের মল-মূত্র হইতে তাবৎ অঙ্গ বিগলিত হইলে একটী দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। উক্ত দুর্গন্ধই সোরাজানের প্রকাশক। যে পদার্থ মধ্যে সোরাজান না থাকে

তাহা বিগলিত হইলে কোন দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয় না। সোরাজানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার ইহা অন্যতম উপায়। সোরাজান ভূগর্ভে থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে উহা যে বাষ্পীয় (Gaseous) পদার্থ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উহা নিরবলম্বাস্থায় থাকিতে পারে না। বায়ুমণ্ডলে থাকিবার কালে অপরাপর বাষ্পীয় পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে এবং ভূগর্ভ মধ্যে থাকিবার কালেও অপরাপর পদার্থের সহিত বিশেষতঃ রস ও ধাতব পদার্থের সহিত মিলিতাবস্থায় থাকে। ভূমিতে যত প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ নিক্ষিপ্ত বা সঞ্চিত হয় তাহাতেই সোরাজান বিদ্যমান থাকে এবং সেই সকল পদার্থ যত বিগলিত হইতে থাকে, সোরাজান তত আলুলায়িত বা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। ক্রমে ভৌতিক ক্রিয়াবলে য়্যামোনিয়া নামক আপেক্ষিক লঘু লাবণিক পদার্থে পরিণত হইলে তবে উদ্ভিদের সূক্ষ্মতম কৈশিক মূলগণ তাহা আহরণ করিতে সক্ষম হয়।

বায়ুমণ্ডলের সোরাজান ভূগর্ভে কিরূপে স্থান পায় তাহা দেখা যাউক। প্রথমতঃ আমরা জানিয়াছি যে, বৃষ্টির সহিত উহা পৃথিবীতে পতিত হয়। অন্য সময়ে, জমিতে যে সকল ফাটল থাকে, স্বভাবতঃ উহা তন্মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর ভূমি কর্ষিত হইলে তন্মধ্যে যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, সেই সঙ্গে সোরাজানও তথায় স্থান পায়। এইরূপে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে ভূগর্ভস্থ অঙ্গারজান (Carbon), চূণ, লৌহ প্রভৃতি পদার্থ উহাকে ধারণ করিয়া রাখে। অতঃপর রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী হয়।

ভিলি সাহেব বলিয়াছেন, বায়ুমণ্ডলের সোরাজান উদ্ভিদগণ

আহরণ করে এবং প্রমাণ স্বরূপ বলেন যে, ভূমিতে সাররূপে যত সোরাজান দেওয়া যায়, তাহাপেক্ষা অধিক সোরাজান উদ্ভিদ মধ্যে দেখা যায়, সুতরাং অতিরিক্তাংশ বায়ুমণ্ডল ভিন্ন অন্য কোথা হইতে আসা সম্ভব? তিনি আরও বলেন যে, এতদ্ব্যতীত অতি সামান্য পরিমাণে য়্যামোনিয়া ও নাইট্রেট বায়ুমণ্ডলে থাকে। বায়ুমণ্ডলে যে য়্যামোনিয়া থাকে বা থাকা সম্ভব ইহা বিশ্বাস্য। নাইট্রোজেনের সহিত জল মিশ্রিত হইলেই য়্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বায়ুমণ্ডলে স্বভাবতঃই জলের দুইটি উপাদান—জলজান (Hydrogen) ও অম্লজান (Oxygen) ত আছেই, সুতরাং য়্যামোনিয়া উৎপন্ন হইবার পক্ষে কোন বিঘ্ন নাই। তবে বায়ুমণ্ডলে য়্যামোনিয়াজাত লবণ (Nitrate) উৎপন্ন হইতে পারে কিনা তাহাই সংশয়ের বিষয়। য়্যামোনিয়া হইতে তজ্জাতীয় লবণ উৎপন্ন হইবার পক্ষে জীবাণু বা উদ্ভিদাণু (Bacteria radicicola) প্রধান সহায় কিন্তু বায়ুমণ্ডলে উক্ত জীবাণু আছে কি না তাহাই বিশেষ সন্দেহের কারণ। বাতাসের শুষ্কতায় ও আলোকের প্রাখর্য্য হেতু তথায় ইহারা থাকিতেই পারে না। আজও কিছু চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই সুতরাং বায়ুমণ্ডলে সোরাজানসম্ভূত লবণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিল। যাহা হউক, নিম্নে আমরা ভিলি সাহেবের নিজ কথা উদ্ধৃত করিলাম :—

(1) "It has been ascertained that crops always contain more nitrogen than the manure supplied to them."

(2) "It is unanimously admitted that a part of the Nitrogen contained in crops has its origin in the atmosphere, but the assimilation of free Nitrogen denied; it is supposed that before being absorbed by plants the Nitrogen passes into the form a Nitrate in the soil. Now, if Nitrogen is assimilated in Lucerne only in the state of Nitrate, we ought evidently to find in the crop a certain amount of the bases (metals) corresponding to the nitric acid, the supposed source of Nitrogen. None, however, are found to exist."

যাহা হউক, এ তর্কে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, কারণ এ ক্ষুদ্র পুস্তকে ঈদৃশ বৃহৎ বিতণ্ডা মীমাংসিত হইবার নহে। আপাততঃ এই মাত্র জ্ঞাত থাকিলেই যথেষ্ট যে, সদ্য বা কাঁচা নাইট্রোজেন কোন উদ্ভিদ পত্র বা মূল দ্বারা আহরণ করিতে পারেনা। মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত হইলে নাইট্রেট্ নামক দ্রবনীয় লবণে পরিণত হইবার পর মূলগণ তাহা আহরণ করিতে সক্ষম হয়।

সোরাজানের গুণ।—সোরাজানসঙ্কুল-পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদ বৃদ্ধিশীল হয়। উক্ত জাতীয় সার নিতান্ত উত্তেজক অথচ উদ্ভিদের অতি উপাদেয় খাদ্য। গাছপালার বৃদ্ধি না থাকিলে কিম্বা গাছপালা শীর্ণ বা বিবর্ণ হইলে সোরাজান-প্রধান-খাদ্য দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এই জন্য

ক্ষেত্রে এতজ্জাতীয় সার প্রদান করিতে হয়। তিসি, সর্ষপ, এরণ্ড-বীজ, কার্পাস-বীজ, মাঠকলাই (চীনের বাদাম) সরগুজা (শুকরগুজর), নারিকেল প্রভৃতি তৈলপ্রধান-শস্যের পিষ্টক মাত্রেই নাইট্রোজেনপ্রধান উদ্ভিদখাদ্য। তৈলদ-শস্যের পিষ্টক বলিয়া তদন্তর্গত তৈল যে, উদ্ভিদখাদ্যের অন্তর্গত, তাহা নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে তৈল নিষ্ক্রান্ত না করিয়া সেই সকল শস্যকে মাত্র চূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিলেই চলিত এবং তাহা হইলে তৈলহীন পিষ্টক অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হইত। উদ্ভিদগণ আদৌ তৈল আহরণ করে না, উপরন্তু খইলের ন্যায় তৈল-সঙ্কুল-পদার্থ কোন ক্ষেত্রে বারংবার ও সমধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইলে মৃত্তিকার অম্ল রোগ বা অজীর্ণ রোগ হয়।*

কেবল যে খৈল প্রদানে ভূমির এই দোষ ঘটে তাহা নহে। মৎস্য, মাংস, শোণিত, অশোধিত অস্থিচূর্ণ (Unsulphurated বা Unsteamed Bonemeal) প্রভৃতি বা তৎসান্নিধ্যজাতীয় উদ্ভিদখাদ্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত হয় বটে, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যেও অল্পাধিক তৈল জাতীয় পদার্থ—মজ্জা, বসা প্রভৃতি যথেষ্ট বিদ্যমান থাকে। উৎকৃষ্ট অস্থিচূর্ণ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সংগৃহীত অস্থি-নখাদি হইতে বাষ্পোত্তাপ (Steam) সহযোগে উক্ত পদার্থ অর্থাৎ গিলেটীন, গ্লিসারিণ প্রভৃতিরূপে বাহির করিয়া লওয়া হয়। উল্লিখিত পদার্থ সমূহ কাঁচা (Raw) অবস্থায়

* গ্রন্থকার লিখিত "মৃত্তিকার অজীর্ণ রোগ" শীর্ষক প্রবন্ধ ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'কৃষি-সম্পদ' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্টে উহা উদ্ধৃত হইল।

ব্যবহৃত হইলে তদন্তর্গত তৈলাংশ বা তদনুরূপ পদার্থের অস্তিত্ব হেতু উহারা নিজেই বিগলিত হইতে সমধিক সময় চাহে। তাহা ব্যতীত, তদন্তর্গত তৈল বা তজ্জাতীয় পদার্থ, ক্রমে পারিপার্শ্বিক মৃত্তিকায় প্রসারিত হইয়া মৃত্তিকান্তর্গত অপরাপর পদার্থকে বিগলিত হইতে দেয় না, ফলতঃ উদ্ভিদগণের খাদ্যাভাব ঘটে। তৈলের অন্যতম গুণ—সংরক্ষণ, ধ্বংসীকরণ বা জীর্ণীকরণ নহে। যে পদার্থকে তৈল নিমজ্জিত করিয়া রাখা যায়, তাহা বহুকাল অবিকৃতাবস্থায় থাকে, এই জন্য এদেশের হিন্দুগৃহস্থ-মহিলাগণ ও চাট্নী-ব্যবসায়ীগণ বহুবিধ অম্ল, আচার, চাট্নী প্রভৃতিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করিবার জন্য তৈল নিমজ্জিত করিয়া রাখেন। মৎস্য মাংসকেও উল্লিখিত প্রণালীতে অবিকৃতাবস্থায় দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারা যায়।

যাহা হউক, নাইট্রোজেনের অপর একটী বিশেষ শক্তি আছে এবং সেই শক্তি-বলে উহা ভূগর্ভস্থ জৈব ও অজৈব পদার্থ রাশিকে শীঘ্র ও সহজে বিগলিত করিতে পারে, কিন্তু সার তৈল-বহুল হইলে তাহা হয় না। বারম্বারও প্রভূত পরিমাণে নাইট্রোজেন-জনিত-সার ব্যবহার-ফলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অবরুদ্ধ হইলে নিঃস্ব বা অসার জমির ন্যায় হইয়া পড়ে; আপাততঃ তাহাতে কিছুদিন কোন ফসলের আবাদ করিয়া সুবিধা হয় না কিন্তু তাহা বলিয়া ক্ষেত্রকে আপনা হইতে রোগ মুক্ত বা দোষ-ক্ষালিত হইবার জন্য দীর্ঘকাল আপতিত রাখায় কোন লাভ ত নাই-ই, বরং তাহা ক্ষতির বিষয়। অতএব তাহাকে সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে ক্ষেত্রে অল্প-মাত্রায় চুণ প্রয়োগ করা উচিত, কারণ তাহা হইলে চুণের

তীব্রতা ও দাহিকা-গুণে অম্ল বিদূরিত হয়। অতঃপর, চুণের নাইট্রোজেন পরিশোষণ শক্তি থাকায়, বায়ুমণ্ডল হইতে তাহা আহরণ করিয়া সংস্থাপিত করে।

অপরাপর প্রাণীজ পদার্থ—খোঁয়াড় বা গোয়ালের আবর্জ্জনা, অঙ্গিনাকুড়ের জঞ্জাল, স্খলিত বা সংগৃহীত উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট—নাইট্রোজেনজনিত-সার হইলেও পোটাস্, চুণ প্রভৃতি নানাবিধ অজৈব পদার্থের প্রচুর সমাবেশ-হেতু তন্মধ্যে নাইট্রোজেনের ভাগ তত অধিক থাকে না, এজন্য এতদ্দ্বারা ভূমির অম্লরোগ উৎপন্ন হইতে না পারে, কিন্তু সমধিক হইলে, মৃত্তিকা অম্লাক্রান্ত না হইয়া লবণাক্রান্ত হয়। লবণাধিক্য ভয়ও মনে রাখা উচিত। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য হরিৎসার (green manure) দিবার পদ্ধতি আছে। হরিৎসারের ব্যবস্থা করিতে হইলে নানাবিধ ফসলের আবাদ করা যাইতে পারে, কিন্তু সীম্বিক ফসলের আবাদ করায় অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ এই যে, উহারা যবক্ষারজনিত ফসল, জীবিতাবস্থায় সমূহ পরিমাণে বায়ুমণ্ডলের যবক্ষারজান পত্রদ্বারা আহরণ করিয়া থাকে উপরন্তু ইহাদিগের মূলদেশে প্রভূত পরিমাণে জীবাণুর আবির্ভাব হয়, তন্নিবন্ধনও ভূগর্ভের ভৌতিকতা পরিবর্দ্ধিত হয়।

হরিৎসার (green manure) বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ (Vegetable matters) মধ্যেও সমূহ পরিমাণে সোরাজান বিদ্যমান সুতরাং অযথা পরিমাণে এ সকল পদার্থও ক্ষেত্রে নিরন্তর নিয়োজিত করা উচিত নহে। নিতান্ত প্রয়োজন বোধে এ স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করিতে হইল। যে সকল ভূমিতে উদ্ভিজ্জপদার্থ যথা-পরিমাণে অবস্থিত, তাহা স্বতঃই লঘু, তদন্তর্গত মৃত্তিকা

কোমল অপিচ স্থিতিস্থাপক। এবম্বিধায়, সে মৃত্তিকার দৃঢ়তা থাকে না। মৃত্তিকার দৃঢ়তা না থাকিলে তজ্জাত উদ্ভিদগণ দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া থাকিতে পারে না, ঈষৎ প্রবল বায়ুতেই উৎপাটিত হইয়া পড়ে, মাটির সরসতা হ্রাস পায় ইত্যাদি অনেক দোষ ঘটে। যে মাটির স্বভাবতঃ এই অবস্থা, তাহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রদত্ত হইলে তাহা যে আরও শিথিল ও লঘু হইয়া পড়িবে ইহা সহজ বুদ্ধিতেই আমরা বুঝিতে পারি। আটাল মাটিতে হরিৎসার বা উদ্ভিজ্জসার দ্বারা বিশেষ উপকার হয়, ইহা আমরা অবগত আছি।

যাহা হউক, নাইট্রোজেনমাত্রই অল্পাধিক অম্লোৎপাদক জানিতে হইবে। উদ্ভিজ্জপদার্থ মধ্যে অপরাপর নাকোচকারী (neutralising) পদার্থ সন্নিবেশিত থাকে বলিয়া সোরাজানের প্রভাব আমরা তত বুঝিতে পারি না, কারণ মিশ্রণহেতু উক্ত পদার্থ সঙ্কুচিতভাবে বা একস্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া প্রসারিতাবস্থায় থাকে।

সোরাজানের প্রকৃতি।—প্রকৃত বা আসল সোরাজান, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তথাপি উহাকে অনাবদ্ধ বা স্বাধীনাবস্থায় পাওয়া যায় না, কারণ আকাশস্থ বায়ুর সহিত সম্বদ্ধ। বায়ু হইতে কৃত্রিম উপায়ে স্বতন্ত্র করিলে নির্ম্মল (Pure) সোরাজান পাওয়া যায়। নির্ম্মল সোরাজান একটী বর্ণহীন বাষ্পীয় পদার্থ এবং চক্ষুর অগোচর। কোন গলনীয় পদার্থ বিগলিত হইবার কালে তাহা হইতে একটী দুর্গন্ধের উদ্ভব হয়, তাহা হইতেই আমরা ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। বিগলন ক্রিয়াফলে সোরাজান অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া য্যামোনিয়ার (Ammonia) আকার ধারণ করে। য্যামোনিয়ার

গন্ধ অতিশয় তীব্র ও অসহনীয়। সঙ্কীর্ণ বা অবরুদ্ধ স্থান মধ্যে য়্যামোনিয়া আবদ্ধ থাকিলে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার বিষম ব্যাঘাত হয়, অধিক কি, অনেক স্থলে প্রাণ হানি হইয়া থাকে। কোন পচা সামগ্রীর দুর্ব্বিসহ গন্ধ আঘ্রাণ করিলে লোকের নানাবিধ পীড়া জন্মিয়া থাকে। বাসস্থানাদি কোনরূপে দূষিতবায়ু না হয়, তদ্বিষয়ে লোকে এই জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখে। জীবোদ্ভিদ-নির্ব্বিশেষে কোন জীবিত পদার্থই পচে না কিন্তু তৎসমুদায়ই সোরাজানের বিশেষ আধারস্বরূপ।

সোরাজানের উদ্ভব।—যাহা হউক, জীব ও উদ্ভিজ্জাত প্রায় তাবৎ পদার্থ গলনশীল কিন্তু শুষ্কাবস্থায় তাহাদিগের পচিবার সামর্থ থাকে না। শুষ্ক উদ্ভিদ বা জীব বা জীবাংশ পচে না কিন্তু যে-ই উহাতে কোনরূপে রসের সমাবেশ হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই গলনোম্মুখ হয়, পরে তাহাতে উত্তাপের সঞ্চার হইলে বিগলন ক্রিয়ার আবির্ভাব হয়। ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, দৃঢ়রূপে চাপিয়া রাখিলে দীর্ঘকালেও কোন জিনিস পচিতে পারে না। ভৌতিক ক্রিয়ার সঞ্চার করিতে হইলে গলনীয় পদার্থে রস ও উত্তাপ—এতদুভয়ের একান্ত প্রয়োজন। গভীর জলমধ্যে কোন গলনীয় পদার্থ নিমজ্জিত থাকিলে বিগলিত হইতে যেরূপ কালবিলম্ব হয়, কেবল উত্তাপসংযুক্ত থাকিলেও সেইরূপ হয়, কারণ জলনিমজ্জন হেতু উত্তাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আবার, উত্তাপ হেতু অন্তরস্থ রস শুকাইয়া যায় এবং বাহিরের রস তাহাতে সঞ্চিত হইতে পায় না—ইহাই হইল গলনরুদ্ধতার কারণ।

বায়ুমণ্ডলে সোরাজানের অংশ।—সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, আকাশস্থ ভাসমান বাতাসে প্রায়

পাঁচভাগের চারিভাগ নাইট্রোজেন। সেই হিসাবে প্রতিবর্গ ইঞ্চ ভূমির উপর বারো পাউণ্ড (প্রায় ⁄৬ সের) নাইট্রোজেন থাকে, কারণ ইহাও আমরা জানি যে, উক্তস্থান মধ্যে পনর পাউণ্ড (প্রায় ⁄৭॥৹ সের) বাতাস সর্ব্বদা বিরাজমান। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, এক বর্গ-ইঞ্চ স্থানে নাইট্রোজেনের অংশই অধিক, এই জন্য পৃথিবীতে কোনকালে নাইট্রোজেনের অভাব হইবার কারণ নাই।

ভূগর্ভে সোরাজান।—অনন্তর ইহাও দেখা যায় যে, ভূমির পৃষ্ঠ-স্তরে (Surface Soil) ব্যাকৃটিরিয়া র‍্যাডিসিকোলা নামক জীবাণু বা উদ্ভিদাণুগণ বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজান আহরণ করতঃ ভূগর্ভে সঞ্চিত রাখে। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, নানাদিক হইতে নানা উপায়ে মৃত্তিকায় সোরাজান সংস্থাপিত হয় এবং তাহাতেও উদ্ভিদের যথেষ্ট না হইলে কিম্বা ক্রমে ব্যয়িত হইয়া হ্রাস পাইলে অথবা অপেক্ষাকৃত বা অধিক উর্ব্বরতা আনয়ন করিবার জন্য, ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন প্রধান সার প্রদান করিতে হয়।

উদ্ভিদের খাদ্য-সামঞ্জস্য।* মনুষ্য ও অন্যান্য জীব-জন্তুর শরীর কৃশ হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহাদিগের খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে, কিংবা উহারা যে সকল খাদ্য ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করে, তাহাতে পুষ্টিকর দ্রব্যের প্রচুর অভাব আছে। সকল জীবই যে খাদ্যাখাদ্যের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পান-

* গ্রন্থকারলিখিত 'উদ্ভিদের খাদ্য-সামঞ্জস্য'-শীর্ষক প্রবন্ধটী হিতবাদী (৪ঠা মাঘ, সন ১৩১৯ সাল) পত্রে প্রকাশিত হয়। প্রয়োজন-বোধে তাহা ইহাতে সংগৃহীত হইল।

ভোজন করে তাহা নহে, তবে সৃষ্টিমধ্যে সকল পদার্থ এমন সুকৌশলে সংরক্ষিত হইয়াছে যে, অনিচ্ছায় ব্যবহার করিলেও তদ্দ্বারা জীবদেহের সকল অভাব পরিপূরিত হইতেছে। গৃহপালিত গবাদি পশুকে খাদ্য দিবার কালে এ সকল বিষয়ে আমরা তাদৃশ বিবেচনা করি না, তথাপি তাহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য দিয়া থাকি। মানুষে তণ্ডুল বা আটা ভোজন করে, কিন্তু তাহাতে শরীরের পরিপুষ্টির উপযোগী সকল পদার্থ থাকে না। তজ্জন্য মানুষ নানাবিধ তরিতরকারী, বিশেষতঃ দালকড়াই প্রভৃতি অপরাপর পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া থাকে। তরিতরকারীর মধ্যে জলীয়ভাগ শতকরা প্রায় ৮০।৯০, বাকী সার-পদার্থ। কিন্তু তাহা হইলেও ভুক্ত বস্তুর সেই ১০ বা ২০ ভাগ সার-পদার্থ আমাদিগের শরীর মধ্যে থাকিতে পায় না, উহার নির্য্যাস-ভাগমাত্র শরীর-মধ্যে থাকিয়া দেহের পরিপুষ্টি সাধন করে। দাল শুষ্ক সামগ্রী অথচ সারপূর্ণ সুতরাং উহা সমধিক পরিমাণে আমাদিগের গ্রহণীয়। দালের মধ্যে যে সার পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা রন্ধনকালে আল্‌গা হইয়া যায়, এবং দালের দানাসমূহ সিদ্ধ হওয়ায় কোমলতা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর উদরস্থ দাল পাকস্থলীর ক্রিয়াবশতঃ সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সমধিক পরিমাণে শরীরে পরিশোষিত হয়। তরি-তরকারী উদরস্থ হইলে উদরপূর্ণ হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা শরীরপোষণের তাদৃশ সাহায্য হয় না। শীর্ণ মানুষকে অথবা পশু পক্ষীদিগকে পরিপুষ্ট করিতে হইলে যবক্ষারজান-প্রধান খাদ্য দিতে হয়, আর উহাদিগের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও পেশী প্রভৃতির দৃঢ়তাসাধন ও শক্তিসংযোজনের জন্য ফস্ফরিক-য়্যাসিড ও পোটাস-প্রধান সারযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এতদ্দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, নাই-

ট্রোজেন-প্রধান খাদ্যই শরীরের পরিপুষ্টির প্রধান উপকরণ। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও সেই কথা। সাধারণতঃ আমরা খৈল ও গোময় দ্বারা মৃত্তিকায় উর্ব্বরতা বিধান করি। যে সকল উদ্ভিদ ঈদৃশ পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়া থাকে, তাহারা অপরাপর উদ্ভিদাপেক্ষা পরিপুষ্ট ঝাড়াল ও উজ্জ্বলবর্ণ হইয়া থাকে। উদ্ভিদগণ প্রাতিনিয়ত অধিক মাত্রায় ঈদৃশ খাদ্য পাইলে তাহাদিগের শরীর দিন দিন এতই স্ফীত ও দীর্ঘ হয় যে, তাহারা অবনত হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত, উহারা ফলফুল প্রসবেও অল্পাধিক অশক্ত হয়। এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদা দেখা যাইতেছে। গাছ এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে লোকে ষাঁড়া-গাছ কহে। অতঃপর ইহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। কৃষকগণ সাধারণতঃ ধান্য গোধূমাদি মেঠো-ফসলের আবাদে প্রায় কোন প্রকার সার ব্যবহার করে না, তথাপি বিস্তীর্ণ ভূমি পরিদর্শন করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন স্থানের গাছগুলি অপেক্ষাকৃত সতেজ, গাঢ়বর্ণসম্পন্ন ও ঝাড়াল হইয়া থাকে। এ বিষয়ে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, সেই বিশেষ স্থানটী হয়ত ক্ষেত্রের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্ন। ঈদৃশ নিম্নতা হেতু জমির জল ও রস সেইদিকে প্রবাহিত হইয়া ভূস্তরে সঞ্চিত থাকে। বলা বাহুল্য যে, জলীয়াংশের সহিত উপরিভাগের নাইট্রোজেনও বহির্গত হইয়া নিম্নস্থানে গিয়া সঞ্চিত হয় এবং তজ্জন্য সেই অনুচ্চ ভূমিজাত উদ্ভিদগণ এত সতেজ, পরিপুষ্ট ও নয়নরঞ্জক হইয়া থাকে। ঈদৃশ উদ্ভিদগণ হয় আদৌ শস্যশালী হয় না, অথবা আশানুরূপ ফল প্রসব করে না। জীব ও উদ্ভিদ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই নাইট্রোজেনর এইরূপ ক্রিয়া হয়। তবে একটী কথা

এই যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রে বা সকল মাটিতেই উদ্ভিদ খাদ্যের সারভূত উক্ত তিনটী পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে থাকেই। এরূপ সারশূন্য জমি বা মাটি নিতান্ত বিরল বলিয়াই সকল ক্ষেত্রেই অল্পাধিক ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদিগের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দূরদর্শন ও অভিজ্ঞতা আছে, উদ্ভিদের আকার-প্রকার দেখিয়া তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, কি কি কারণে সে উদ্ভিদগণ তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াছে।

সামঞ্জস্য সংরক্ষণ করিতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য তাহাই এক্ষণে চিন্তার বিষয়। এ স্থলে সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। উদ্ভিদের যথার্থ পরিপুষ্টির পক্ষে যে যে উপকরণ, যে যে পরিমাণে আবশ্যক, সেগুলি সেই সেই পরিমাণে মাটিতে থাকা একান্ত প্রয়োজন। কোন উপদানের পরিমাণের অল্পতা ঘটিলে তাহার পূরণ করিতে হয়। ইহাই হইল সামঞ্জস্য রক্ষার প্রকৃষ্ট নীতি। মৃত্তিকায় কোন উপাদানের অভাব বা আধিক্য ঘটিলে উদ্ভিদে তাহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইবে। মাটিতে নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য অধিক বা অল্প হইলে উদ্ভিদের ক্ষতি হয়। এতদ্ব্যতীত ভূমিতে কোন উপাদানের আধিক্য হইলে উদ্ভিদগণ অতিরিক্তাংশ পরিত্যাগ করে। পরিত্যক্ত উপাদান, হয় চুয়াইয়া ভূগর্ভের নিম্নতম দেশে নামিয়া যায়, কিংবা শুকাইয়া বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়, সুতরাং তাহাতে ভূমিরও ক্ষতি এবং ক্ষেত্রস্বামীরও বিশেষ ক্ষতি। ফস্ফরিক-য়্যাসিড্ বা পোটাস সমধিক পরিমাণে থাকিলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ উহা স্থূল ও মৌলিক পদার্থ। প্রয়োজনমত উদ্ভিদগণ এতদুভয় পদার্থকে আহরণ করে, অবশিষ্টাংশ ক্ষেত্রেই অবরুদ্ধ থাকে এবং পরে ভাবী ফসলের বা উদ্ভিদের ব্যবহারে

লাগে। উক্ত দুই সামগ্রী চুয়ায় না বা শুকায় না। বৃদ্ধিশীল ও শাখাপ্রশাখা-সম্পন্ন হইলে উদ্ভিদগণ নিজ নিজ প্রয়োজনমত, অথচ ক্ষীণাবয়ব উদ্ভিদাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উক্ত দুই পদার্থ আহরণ করিতে পারে। মূল ও পত্র উদ্ভিদের পরিপুষ্টির প্রধান সহায়। কারণ ইহারাই উদ্ভিদের খাদ্যসম্ভারের সংস্থান করে এবং উক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় পদার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক উদ্ভিদ শরীরের পরিপুষ্টি সাধন করে।

যাহা হউক, প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদগণ আসল নাইট্রোজেন আহরণ করিতে সমর্থ নহে। উহা বাষ্পীয় সামগ্রী এবং জলের সহিত মিশ্রিত না হইলে উদ্ভিদের আহারণোপযোগী হয় না। নাইট্রোজেন, য়্যামোনিয়া নামক পদার্থে পরিণত হইলে তবে উদ্ভিদ-শরীরে প্রবেশাধিকার পায়। বহুপ্রকার সারের মধ্যে এমোনিয়া বিদ্যমান এবং ইহারই বিদ্যমানতা নিবন্ধন উদ্ভিদে বহুবিধ বর্ণ সঞ্জাত হয়। তাহা ব্যতীত, জীব-জাত পদার্থসমূহ—মল মূত্র, রক্ত মাংস, দুগ্ধ, বৃষ্টি জল ও তুষার প্রভৃতিতে বহুল পরিমাণে এমোনিয়া থাকে। জিপসম, উদ্ভিজ্জ কয়লা বা অসম্পূর্ণ বিগন্ধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং পোড়া মাটি সাররূপে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাররূপে যত কাজ করুক বা না করুক, ইহারা এমোনিয়াকে পরিশোষণ করিয়া রাখিতে পারে বলিয়া ইহাদিগকে যত্নসহকারে ব্যবহার করা হয়। সার-কুড়ে অনেক সময়ে ঐ সকলের কোন একটী পদার্থ আমরা সংযোজিত করিয়া উহাকে বায়ুমণ্ডলে উড়িয়া যাইতে দিই না। অম্লসংপৃক্ত লৌহ বা লৌহের মরচে (oxide of Iron) ও লৌহপ্রবণ পদার্থ (Ferruginous matters) ও উক্ত শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া

এমোনিয়াকে অবরুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত পদার্থ অধিক পরিমাণে মাটিতে মিশাইতে হইলে উহা উদ্ভিদের রুচিকর ত হয়ই না বরং তদ্দ্বারা উদ্ভিদের ক্ষতি হইয়া থাকে। একটী উদ্ভিদকে অগ্নির সাহায্যে ভস্মীভূত করতঃ ভাল করিয়া বিশ্লেষিত করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কত সামান্য পরিমাণ লৌহ, তাহার মধ্যে অবস্থান করে। প্রায় সকল প্রকার জমিতেই অল্পাধিক লৌহ থাকিতে দেখা যায় এবং তাহাতেই উদ্ভিদের অভাব বিমোচন হয়, তাহা ব্যতীত প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ বা খনিজ সকল পদার্থেই লৌহ থাকে। সেই সকল পদার্থ ভূমিতে সংযোজিত হইলে পরবর্ত্তী উদ্ভিদগণের আর লৌহের অভাব হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লৌহ অতি সামান্য পরিমাণে উদ্ভিদ শরীরে পাওয়া যায় কিন্তু তাহা হইলেও, সেই সামান্য পরিমাণ লৌহও উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ তাহা না হইলে উদ্ভিদ মধ্যে 'পত্র-হরিৎ' (Cholorophyl) উৎপন্ন হয় না। আবার পত্র-হরিৎ না হইলে উদ্ভিদমধ্যে শ্বেতসার (Starch) এবং কাষ্ঠাংশ বা কঙ্কাল (Woody Structure) সঞ্জাত ও পুষ্ট হইতে পারে না।

ইতঃপূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, সমস্ত জৈব-পদার্থ (Vegetable or Organic matters) ও বৃষ্টিজল ভূমিতে সঞ্চিত হয়। এতদ্ব্যতীত ভূগর্ভেও বহু পূর্ব্বকালের জৈব-পদার্থ সঞ্চিত থাকায় নাইট্রোজেনের সংস্থান হয়। নাইট্রোজেন হইতে য্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়, কিন্তু য্যামোনিয়ার এমন শক্তি নাই যে, তাহা স্বয়ং উদ্ভিদ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং উদ্ভিদের এরূপ কোন যন্ত্র নাই যদ্দ্বারা ইহা য্যামোনিয়াকে

যথাযথভাবে আহরণ করিতে পারে। ইহাকে উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত করিবার জন্য বহিঃস্থ সাহায্যের প্রয়োজন। জীবাণু* বা উদ্ভিদাণুসমূহই সেই সহায়স্বরূপ। ইহারা নগণ্য ও অচক্ষুর্গোচর হইলেও অসীম শক্তিশালী। ইহারা অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত, এবং জাতিবিশেষের কাজও স্বতন্ত্র। ইহাদিগেরই জাতিবিশেষ (Bacteria radicicola) মাটিতে থাকিয়া এমোনিয়াকে জীর্ণ ও রূপান্তরিত করিয়া নাইট্রিক্ এসিড নামক দ্রাবকে পরিণত করিলে তবে, সেই দ্রাবক মৃত্তিকান্তর্গত চূণ, পট্যাস, সোডা বা তাদৃশ পদার্থ সহযোগে যে লবণ (nitrites or nitrates) উৎপাদন করে, তাহাই উদ্ভিদ আহরণ করে। সোরা ঐ জাতীয় লবণ।

কাঁচা বা অজীর্ণ জৈব-পদার্থ লবণে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কত অবস্থান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহা ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা শেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে ও বিপক্ষে কতকগুলি জিনিষ ও অবস্থার অনুকূলতা দৃষ্ট হয়। ঐ সকল জিনিষ ও অবস্থার আনুকূল্য বা প্রতিকূলতা ঘটিলে নাইট্রোজেন—এমোনিয়ায় পরিণত হইয়া—স্থির থাকে, উদ্ভিদের কোন কাজে লাগে না। যে কয়টী দ্রব্য উহার অনুকূল তাহা বিবৃত হইল:—

(১) মৃত্তিকার সরসতা; (২) মৃত্তিকার লঘুতা বা সচ্ছিদ্রতা (porousity); তন্নিবন্ধন মাটির মধ্যে বায়ুসঞ্চালন; (৩) মৃত্তিকা

* সংকৃত 'জীবাণু ও উদ্ভিদ' নামক পুস্তকে উক্ত বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

মধ্যে যথোচিত উত্তাপ। এতদ্ব্যতীত মাটিতে জিপসম্ প্রভৃতি থাকিলে উহার ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি পায়। অনন্তর ইহাও দেখা যায় যে, গভীর মৃত্তিকা মধ্যে ব্যাক্‌টিরিয়াগণ যেমন থাকিতে পারেনা, তেমন ভূপৃষ্ঠের আলোকময় স্থানেও থাকিতে পারে না। তথাকার মাটি ব্যবহার করিলে উদ্ভিদগণ সদ্য সদ্য ফল পায় না, কারণ তথাকার মৃত্তিকায় বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, ফলতঃ ব্যাক্‌টিরিয়া সময়ে জন্মে না। জলমগ্ন মাটিতে উত্তাপ বা বাতাস থাকে না। তাহারও ফলে তথাকার মাটিতে উহারা জন্মে না বা বাচে না। চুণ, ক্ষার প্রভৃতি তীব্র পদার্থের সংস্পর্শেও ইহারা থাকিতে পারে না, এ জন্য লোনা মাটিতে ইহাদিগকে দেখা যায় না। এরূপ মাটিতে দীর্ঘকাল সার দিতে দিতে কিম্বা সমধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করিলে তবেই ক্রমে তাহাতে উহাদিগের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

ফস্‌ফরিক য়্যাসিড্ (**Phosphoric acid**)।—উক্ত য়্যাসিড্ বা অম্ল একটী যুক্ত পদার্থ, ফস্‌ফরস ইহার ভিত্তি, কিন্তু ফস্‌ফরস্ মৌলিক (Elementary) পদার্থ। প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীর সংগঠনার্থ উক্ত পদার্থ বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং ইহা উদ্ভিদখাদ্যের অন্যতম উপাদান। ফস্‌ফরিকাম্ল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আসল মৌলিক পদার্থ—ফস্‌ফরস্ কি, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। সৃষ্টিমধ্যে অসম্বদ্ধ (Free) ফস্‌ফরস্ পাওয়া যায় না, অথচ জীব, উদ্ভিদ, ও খনিজ পদার্থ মধ্যে বহুল পরিমাণে উহা অবস্থিত। প্রাণী ও উদ্ভিদ শরীরের মানবীয় শিরা, অস্থি প্রভৃতি গঠনের জন্য যেরূপ উহার প্রয়োজন, সেইরূপ সজীব জীবকোষের (living cell) অন্তঃস্থিত লালা (Protoplasm) সমুৎপন্ন

করিবার জন্য সেইরূপ প্রয়োজন।* যাহা হউক, সৃষ্টি মধ্যে উহা একাকী না থাকিয়া বহু পদার্থের মধ্যে থাকিয়া বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। আসল ফস্‌ফরস্ উৎপন্ন করিতে হইলে প্রক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা খনিজ পদার্থ বা অস্থি, নখ, বা তজ্জাতীয় পদার্থ হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া লইতে হয়। ফস্‌ফরস্-সমন্বিত খনিজ পদার্থসমূহকে ফস্‌ফেট্ (Phosphate) কহে, কিন্তু দ্রব্যবিশেষের স্বতন্ত্র নাম আছে, যথা—ক্যালসিয়ম, পোটাসিয়ম, সোডিয়ম, ম্যাগ্নেসিয়ম। এই কয়টী, বিশেষতঃ—ক্যালসিয়ম্ ফস্‌ফেট্, কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযোগী এবং প্রায় সকল প্রকার উর্ব্বরা মাটিতেই অল্পাধিক পরিমাণে থাকিতে দেখা যায় কিন্তু প্রকৃষ্ট ফসল উৎপাদনের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে, কারণ প্রায় সকল উদ্ভিদই উক্ত পদার্থ বহুল পরিমাণে আহরণ করে, ফলতঃ ক্ষেত্রের মাটি সহজেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইক্ষু, ধান্য, গোধূম, যব, যৈ, দ্বিদল প্রভৃতি নানা ফসল উক্ত পদার্থ সমূহপরিমাণে আহরণ করে। কৃত্রিম উপায়ে উক্ত পদার্থ সাররূপে ক্ষেত্রে প্রদান না করিলে চলে না। জমায় কম অথচ ব্যয় অধিক থাকিলে সামঞ্জস্য বিধানার্থ জমার মাত্রা বাড়াইবার উপায় অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সোরাজান, মাটি হইতে খরচ হইলেও, বায়ুমণ্ডল

* ডিম্ব মধ্যে জলীয় পিচ্ছিল যে পদার্থ দৃষ্ট হয়, উদ্ভিদান্তর্গত তদনুরূপ পদার্থকে Protoplasm কহে। উহাকে লালা বলিলে চলিতে পারে। ইহা যে অতিশয় লঘু ও তরল তাহা নহে, তবে জলীয় ভাগের তারতম্যে অল্পাধিক তরল হয়। ইহার মধ্যে শ্বেতসার দানা (Starch) বা তৈল সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা, জল ও ধাতবীয় পদার্থ বিমিশ্রিত ভাবে থাকিতে দেখা যায়। উত্তাপ লাগিলে ডিম্ব মধ্যস্থ লালা যেরূপ জমিয়া যায়, উদ্ভিদের Protoplasm ও তদ্রূপ জমিয়া যায়।

হইতে তাহা যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ফস্ফেটিক সার সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। কৃত্রিম উপায়ে নানাবিধ সামগ্রী হইতে যে ফস্ফরস্ উৎপাদন করা হয়, তাহা কৃষিকার্য্যের কোন প্রয়োজনে আসে না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিশেষ তথ্যানুসন্ধানে আমাদের প্রয়োজন নাই, তবে জানিয়া রাখায় ক্ষতি নাই যে, ইহা কি পদার্থ? প্রকৃত বা বিশুদ্ধ ফস্ফরস্ মোম সদৃশ ও বর্ণহীন বস্তু। জলের সহিত মিশে না এবং লঘুতা নিবন্ধন জলে ভাসে। বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে উহা হইতে ধূম নির্গত হয় এবং প্রজ্জলিত হইলে উহা হইতে একটী দুর্গন্ধ নির্গত হয়। অন্ধকার মধ্যে রাখিলে উহা হইতে একটী সুন্দর নীল বর্ণের আলোক বিকীর্ণ হইতে থাকে। আলোকত্ব হেতুই উহার নাম ফস্ফরস্ (Phosphorous) হইয়াছে। ইহার ধাত্বর্থ (Phos = light, fero = I bring) আলোক। অনেকে 'আলেয়া' ভূতের নাম শ্রুত আছেন। অন্ধকার রজনীতে ভাগাড়ে সময়ে সময়ে আলোক ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সকল স্থানে সহরের আবর্জ্জনারাশি নিপতিত হয়, সে সকল স্থানেও এইরূপ ভ্রাম্যমান আলোক রাত্রিকালে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল আলোক মৃত জীব-জন্তু-সম্পর্কীয় ফস্ফরস্ ভিন্ন আর কিছু নহে। অন্ধকারময় স্থানে রাত্রিকালে জোনাকি হইতে ঘন ঘন যে আলোকের বিকাশ হয় তাহাকে ফস্ফরস্ জানিতে হইবে। অন্ধকারে মহীলতা হইতেও ঈদৃশ আলোক বিকীর্ণীত হয়। ইহাদিগের শরীরে ফস্ফরসের আধিক্য হেতু এইরূপ হইয়া থাকে। আমরা যে বিলাতী দেশলাই ব্যবহার করি তাহার মূল উপাদান—ফস্ফরস্, এবং ঘর্ষণ

করিলে একটী দুর্গন্ধও পাওয়া যায়। এক প্রকার দেশলাই আছে তাহা অন্ধকারে কোন বস্তুতে ঘর্ষণ করিলে তাহাতে আলোকময় একটী দাগ পড়ে, তাহা ফস্‌ফরস্‌ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহার আলোকের উত্তাপ নাই।

ফস্‌ফেট।—ফস্‌ফরস্‌-সম্পর্কীয়-পদার্থ, তবে উদ্ভিদ-ভস্মেও পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উহা মাটিতে না থাকিলে আদৌ চলে না। আলেয়া-জাত সার দ্বারা ফসলের তত পরিমাণ বাড়ে না বটে, কিন্তু উদ্ভিদের, এবং তদ্দ্বারা ফল বা শস্যের পরিপুষ্টি, সারবত্তা প্রভৃতি গুণের সমূহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ফসলের কাণ্ড বা শাখা-পল্লবাদিরও সমূহ দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বৃক্ষলতাদির শারীরিক পরিবৃদ্ধির জন্য সোরাজান যেরূপ একান্ত প্রয়োজন, তাহাদিগের দৃঢ়তা এবং ফসলের অর্থাৎ শস্যাদির পরিপুষ্টির জন্যও ইহা সেইরূপ অবশ্য-প্রয়োজন। জীবিত প্রাণীগণের পক্ষে এতজ্জনিত খাদ্যও বিশেষ আবশ্যক।

যাহা হউক,—ধাতব পদার্থের সহিত সম্মিলিত থাকিবার অবস্থায় ইহা ফস্‌ফেট্‌ নামে অভিহিত হয় এবং এতজ্জনিত যে সকল পদার্থ, ইতঃপূর্ব্বে তাহাদিগের নামোল্লেখ করিয়াছি। অস্থিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে উক্ত পদার্থ বিদ্যমান থাকে। একখণ্ড অস্থিকে উত্তমরূপে দগ্ধ করিলে শুভ্রবর্ণের সূক্ষ্ম ভস্ম উৎপন্ন হয়। উক্ত ভস্মকে ওজন করিলে দেখা যায় যে, তদন্তর্গত সমগ্র দহনীয় বা বাষ্পীয় পদার্থ প্রজ্জ্বলনকালে মুক্তিলাভ করিয়া বায়ুমণ্ডলে গিয়া মিশিয়াছে, ফলতঃ এক্ষণে ভস্মের ওজন, অস্থির অর্দ্ধেক বা তাহারও কম। উক্ত ভস্ম ভৌমিক (Earthy) পদার্থ সুতরাং উহার

বিনাশ নাই। উক্ত ভস্ম মধ্যে দশভাগ মাত্র ফস্‌ফরস্‌ থাকে। যাহা হউক, উক্ত ভূমিজাত ফস্‌ফেট্‌ নানাবিধ বিশেষ বিশেষ প্রস্তর, লৌহসঙ্কুল-মাটি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু অস্থিজাত পদার্থই সচরাচর কৃষিকার্য্যের অনুকূল ও সহজ লভ্য বলিয়া ইহার প্রচলন অধিক।

অস্থিচূর্ণ বা অস্থিভস্ম হইতে ফস্‌ফরিক-অম্ল (Phosphoric acid) প্রস্তুত হয়। গন্ধকাম্ল বা গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric acid) অতিশয় জীর্ণকারী দ্রাবক। ইহারই সহযোগে অস্থিচূর্ণকে বা অস্থি-ভস্মকে শোধন করিলে সুপার-ফস্‌ফেট্‌ (Superphosphate) নামক আশু ব্যবহারোপযোগী উদ্ভিদখাদ্য পাওয়া যায়। অস্থি বা তজ্জাত কয়লা বা ভস্ম এদেশের লোকে—হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে—ব্যবহার করিতে বড়ই নারাজ। এইজন্য বোধ হয় এদেশে ইহার চলন নাই। আরও বোধ হয়, কৃষিকার্য্যে ইহার ব্যবহারে লাভ বা উপকার আছে, সে বিষয়ে অজ্ঞতাও ইহার অব্যবহারের অন্যতম কারণ। গ্রন্থকার যখন ইহা ব্যব-হারের সূত্রপাত করেন, তখন তদধীনস্থ লোকজনেরা কিছুতেই তাহা স্পর্শ করিতে চাহিত না। অতঃপর তিনি স্বয়ং বারম্বার স্পর্শ ও স্বহস্তে ব্যবহার করিতে থাকিলে তবে ক্রমে তাহারা ব্যব-হার করিতে অভ্যস্থ হয়। বর্ত্তমান অবস্থা ত এই। সুতরাং কৃষকগণ বা কুলিমজুরেরা যে সহজে অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিবে তাহা সন্দেহের কথা, তবে সুপারফস্‌ফেট্‌ ব্যবহার করিতে পারে, কারণ শোধিত হইলে ইহা বিবর্ণ হইয়া যায়, তখন অস্থির কোন চিহ্ন থাকে না। এদেশে কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্যে যে, অস্থির ব্যবহার ছিল তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়

না, তবে শুনিয়াছি যে, কোন কোন দেশে বিশেষ বিশেষ ফলকর বৃক্ষের গোড়ায় অস্থিখণ্ড পুতিয়া দেওয়া হয়। সচরাচর দেখা যাইত—মৃত পশু পক্ষী প্রভৃতি জন্তুর মৃত দেহ যথা-তথা পতিত থাকিত, কেহ তাহা গ্রাহ্য করিত না, ইদানীং অস্থিসমূহ প্রায় সর্ব্বত্র নিয়মিতরূপে সংগৃহীত হয়। অতঃপর তৎসমুদায় বড় বড় সহরে, পেষিত হইয়া বিক্রীত হইবার জন্য কিম্বা বিদেশে রপ্তানির জন্য, প্রেরিত হয়। এ দেশে যাহা কিছু বিক্রয় হয়, তাহার প্রায় সাড়ে পনর আনা ভাগ সাহেবদিগের চা, কাফি প্রভৃতি এষ্টেটে বা বাগিচায় চালান যায়, বাকী অর্দ্ধ আনা হয়ত ভারতীয় কাজে নিয়োজিত হয়। দেশ হইতে এইরূপে রাশি রাশি অস্থি জাহাজ বোঝাই হইয়া নানা দূরদেশান্তরে চলিয়া যাওয়া ভারতীয় কৃষির পক্ষে নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়! এখান হইতে নিয়মিতভাবে বানিজ্য-পণ্যরূপে সমুদ্রপারে চালান হইবার পূর্ব্বে কেহ ইহার সংবাদ রাখিত না, কিন্তু এক্ষণে রপ্তানি হইবার কাল হইতে লোকে একটা হৈ-চৈ করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, দেশের সর্ব্বনাশ হইল, দেশের উৎপাদিকা-শক্তি বিলুপ্ত হইল, ইত্যাদি আরও কত প্রলাপোক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার রপ্তানি-স্রোত রোধ না করিয়া কিম্বা দেশের মধ্যে দেশীয় কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত না করিয়া, এইরূপে বৃথা আন্দোলন হয় বলিয়া প্রলাপোক্তি বলিলাম। অস্থিগুলি যথা-তথা পতিত থাকিলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা কোনমতে বৃদ্ধি পায় না, কিম্বা কৃষির কোন উপকার হয় না, তবে দেশের সামগ্রী দেশ মধ্যে আবদ্ধ থাকে—এই পর্য্যন্ত! ইহাতে লাভ কি? একখানি অস্থি পতিতাবস্থায়

থাকিয়া বিগলিত হইতে কত কাল সময় লাগে, তাহা অবশ্য আমরা পরীক্ষা করি নাই, কিন্তু ইহা আমরা জানি যে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে সকল মানুষকে কবর দেওয়া হইয়াছিল, ভূগর্ভ খননকালে অনেক স্থলে দেখিয়াছি, সেই সকল কবরস্থিত কঙ্কালাস্থির কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। দৃঢ়রূপে মাটির চাপ থাকিলে অস্থি কেন, কঠিন ধাতু—লৌহও জীর্ণ হইতে বহু কালবিলম্ব ঘটে। মাঠে-ঘাটে অস্পর্শিত বা অযত্নাবস্থায় পতিত থাকিলে রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশিরাদির সংযোগে দীর্ঘকালে অল্পে অল্পে উহাদিগের ক্ষয় হইতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা কৃষির কি উপকার হয়? এ দেশে যে কতদিনে অস্থি, উদ্ভিদের খাদ্যরূপে, ব্যবহৃত হইবে তাহা বলা যায় না। অস্পৃশ্যতা হেতু কেহ ইহা ব্যবহার করিতে রাজি নহে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তথাপি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেষ্টায় উহার ব্যবহার তাঁহাদিগের ক্ষেত্রে বা উদ্যানকার্য্যে প্রচলিত হইবার পক্ষেও অপর একটী প্রতিবন্ধক আছে, এবং সে প্রতিবন্ধক—দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা। এস্থলে বলিয়া রাখি যে, শিক্ষিত হইলেই যে ধনী হইবে এরূপ কোন কথা নাই। খৈল, গোময়াদি যেরূপ সহজে ও স্বল্পমূল্যে এবং যথা-তথা পাওয়া যায়, অস্থিসম্পর্কীয় সার যতদিন না সেভাবে সহজে প্রাপ্য হয়, ততদিন ইহা সাধারণভাবে দেশ মধ্যে প্রচলিত হইবার কোন আশা দেখা যায় না। আজকাল দেশমধ্যে কতকগুলি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা যে কিছু উৎপন্ন করে তৎসমুদায় প্রায় চা-বাগিচায় চলিয়া যায়। চাষীগণ কিম্বা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে আদৌ তাহা হয়ত পৌছে না। কৃষকগণ ত ইহার ব্যবহার জানেই না, মধ্যবিত্ত কৃষিকর্ম্মনিরত

ব্যক্তিগণের মধ্যেও সকলে উল্লিখিতরূপ নানা কারণবশতঃ ইচ্ছা সত্ত্বেও ব্যবহার করিতে পারেন না। মফঃস্বলে সাধারণ্যে পণ্যদ্রব্যরূপে ইহার অল্লাধিক চাহিদা (demand) থাকিলে স্বতঃই সেস্থানে দোকান বা আড়ত সংস্থাপিত হইতে পারিত কিন্তু সেরূপ চাহিদা কই? ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন হইলে, তাঁহাদিগকে কলিকাতায় খরিদ করিবার পর, চালানের তাবৎ খরচা বহন করিয়া উহাকে লইয়া যাইতে হয়, কাজেই তাহাতে খরচ অধিক পড়ে। তাহা ব্যতীত, আমদানি করিতে নানা ঝঞ্ঝটও আছে। এত খরচ ও ঝঞ্ঝট স্বীকার করিয়া কৃষি বা উদ্যান-কার্য্য করিতে পারেন এরূপ ব্যক্তির সংখ্যাও সামান্য। ফস-ফেটিক্-সার উদ্ভিদের যে একটী বিশেষ খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তাহা যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনি এতজ্জাতীয় সার ব্যবহার না করিয়া পারেন না।

অপরাপর অনেক জৈবসার মধ্যে ফসফরস্ আছে তাহা স্বীকার করি এবং সেই জন্য উক্ত সার ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইলে উদ্ভিদগণ তাহা হইতে ফস্ফরিক্ পদার্থ আহরণ করিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল সামগ্রী মধ্যে অপরাপর পদার্থের প্রাধান্যবিধায় উদ্ভিদ-শরীরে শেষোক্ত পদার্থের যত অধিক কার্য্য-কারীতা উপলব্ধি হয়, ফস্ফরিক পদার্থের ফল তত দেখা যায় না, কিন্তু তাহার সহিত ফস্ফরাসপ্রধান কোন দ্রব্য সংমিশ্রিত থাকিলে তবে তাহার ফল বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। প্রাণী-বর্জ্জন—মুত্রপূরীষ, অথবা খৈল বা উদ্ভিজ্জাবর্জ্জনা—এ সকল জিনিষেরই মধ্যে ফস্ফরিক-য়্যাসিড্ অল্লাধিক বিদ্যমান আছেই, কিন্তু তদ্দ্বারা উদ্ভিদের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয় না, ফসলের উৎ-

কর্ষতা বৃদ্ধি পায় না, এই কারণেই ফস্‌ফরসপ্রধান কোন সার ব্যবহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ফস্‌ফরিক-সার আহরণ করিতে যে ব্যয় বা ঝঞ্ঝট আছে তাহাকে উপেক্ষা করিতে হইবে এবং যাহাতে উত্তম ও অধিক ফসল উৎপন্ন হয় সেই বিষয়েই চিরদিন লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। এইজন্য সংক্ষিপ্ত-কৃষির আমরা বিশেষ পক্ষপাতী—এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি এবং 'ভূমিকর্ষণ' পুস্তকেও তাহার উপকারীতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। আমাদিগের বিশেষ আগ্রহ ও ইচ্ছা যে, কৃসিকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিমাত্রেই ইহা ব্যবহার করেন। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার উপকারীতা বুঝিতে পারিবেন।

ফস্ফেটিক সারের বিশেষত্ব।—এই জাতীয় সারের আমরা একান্ত পক্ষপাতী এই জন্য :—বিগত ২৪।২৫ বৎসরকাল অস্থিচূর্ণ ও সুপার (সুপার-ফস্‌ফেট্) প্রতিনিয়তই নানাবিধ ফলফুল, কৃষি ও ঔদ্যানিক ফসলে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি এবং ইহার ব্যবহারে কখনও যে, ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি এরূপ মনে হয় না। কেবল গোময় বা খৈল দ্বারা আশা মিটে না, তবে ইহাতে কিছু ব্যয় আছে বলিয়া প্রথমাস্থায় মনে হয় কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে সে যুক্তির সার্থকতা তিষ্ঠে না। বিনা ব্যয়ে কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। ইহা ঘনীভূত (Concentrated) বিশেষ সার, সুতরাং গোময়াদি মিশ্রণ-সার আনয়ন করিতে এবং যথানিয়মে সারের উপযোগী করিতে যে পরিশ্রম ও ব্যয় আছে, অস্থি-চূর্ণাদি বিশেষ সার আনয়নে তত খরচ বা শ্রম করিতে হয় না। পাঁচ বা দশ সের অস্থিচূর্ণ হইতে যতটা ফস্‌ফরিক-অম্ল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ২।৪ গাড়ী গোময় বা ২।৪ মণ খৈল মধ্যে তাহা

পাওয়া যায় না, সুতরাং এই হিসাবে শেষোক্ত সারকে সুলভ ও সহজ-প্রাপ্য বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, নিজ নিজ প্রয়োজনমত একবারে কিছু অধিক পরিমাণে আনাইয়া রাখিতে পারিলে দীর্ঘকাল রাখিতে পারা যায় কিন্তু অপরাপর জৈব-সার সম্বন্ধে সে কথা বলা চলেনা, কারণ সে সমুদায় অল্লাধিককাল মধ্যে ভৌতিক কারণে বিকৃত হইতে থাকে, ফলতঃ তাহা হইতে বাষ্পীয় পদার্থ ক্রমশঃ নিঃসারিত হইতে থাকে। ফসফেটিক পদার্থ স্বভাবতঃ অজৈব পদার্থ প্রধান, অপিচ শুষ্ক নীরস, কাজেই সহজে বিগলিত বা উত্তপ্ত হইতে পারে না, অথচ প্রয়োজন হইলেই ভাণ্ডার হইতে আনিয়া অল্লাধিক কালমধ্যে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু খইল বা গোময় সম্বন্ধে সে উপায় অবলম্বন করিলে চলে না। গৃহমধ্যে অতি সাবধানে রাখিলেও খৈল বিবর্ণ হইয়া যায়, মুষিক, গন্ধমুষিক প্রভৃতির উপ-দ্রব হয়, অতঃপর প্রাকৃতিক উত্তাপের (Temperature) ব্যতিক্রম ঘটিলে বা তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে, কিম্বা কোনরূপে বায়ু-মণ্ডলের আর্দ্রতা সংক্রামিত হইলে উহাতে পচন আরব্ধ হয়। পচনের সূত্রপাত হইলেই তাহা হইতে দুর্গন্ধ উদ্ভাবিত হইয়া স্থানীয় বায়ুকে দূষিত করে, তন্নিবন্ধন বসবাসের পক্ষে সন্নিহিত স্থান অস্বাস্থ্যকর, অধিক কি, অাবাসযোগ্য হইয়া পড়ে। ফসফেটিক সারের এ সকল আপদ নাই। তাহা ব্যতীত,—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এতজ্জাতীয় সার উদ্ভিদের একটী বিশেষ খাদ্য কিন্তু অপরাপর পদার্থের ন্যায় ইহাও প্রতিবৎসর প্রত্যেক ফসলের সহিত, প্রত্যেক তৃণটীর সহিতও, ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাইতেছে। গোচারণের মাঠ হইতেও উহা

বহিস্কৃত হইয়া যাইতেছে, দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জীবগণের পুরীষ বা মূত্র হইতে অতি সামান্যই ফস্‌ফেট্‌ বা পটাস পাওয়া যায়, কারণ উক্ত পদার্থদ্বয় শরীর গঠনার্থ অধিকাংশ ভাগ শরীর মধ্যে থাকিয়া যায়। ফস্‌ফেট্‌ না থাকিলে কোন খাদ্য পুষ্টিকর হয় না। সোরাজান দ্বারা শরীরের স্থূলতা বৃদ্ধি পায়, ইহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে জানিয়াছি এবং তদ্দ্বারা নালা, শিরা, অস্থিপঞ্জরাদি পরিপুষ্ট বা দৃঢ় হইতে পারে না। এতদর্থে ফস্‌ফেটের প্রয়োজন কিন্তু মৃত্তিকা মধ্যে উক্ত পদার্থের অভাব থাকিলে কিম্বা উহার পরিমাণ হ্রাস পড়িলে মনুষ্য হইতে তদেতর প্রাণী পর্য্যন্ত এবং উদ্ভিদগণ কোথা হইতে তাহা সংগ্রহ করিবে? মৃত্তিকা মধ্যে স্বভাবতঃ উক্ত পদার্থের অল্পাধিক বিদ্যমানতা দেখা যায় বটে, কিন্তু যে পরিমাণে উদ্ভিদ দ্বারা আহরিত হয় অতঃপর তাহা ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া যায়, ফলতঃ তাহা কৃত্রিম উপায়ে সংযোজিত না হইলে অবশ্যই ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা হ্রাস পাইবে। ক্ষেত্রের চির-উর্ব্বরতা বজায় রাখিবার জন্য ফসফেট্‌রূপে অস্থি বা অস্থিজাত সার ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ক্ষেত্রে উক্ত পদার্থের সমাবেশ করিতেই হইবে। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এবং ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করিতে হইলে এক্ষণে আমাদিগকে সহজপ্রাপ্য অস্থিসার ব্যবহার করিতেই হইবে।*

* আমরা অনেকস্থলে অস্থিসার শব্দের উল্লেখ করিয়াছি। মৎস্যের কণ্টক ও আঁশ, শম্বুকের আবরণ, প্রভৃতিও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত জানিতে হইবে। অস্থিচূর্ণ বা তজ্জাত পদার্থ অর্থ ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত সহজপ্রাপ্য, এইজন্য অস্থিসারের উল্লেখ করা গেল। ইহাদিগকে চূর্ণকরতঃ দ্রাবকশোধিত করিলে 'সুপার' উৎপন্ন হয়।

অস্থিচূর্ণ নানা আকারের হইয়া থাকে কিন্তু চূর্ণ যত অধিক সূক্ষ্ম হয় তত শীঘ্র কার্য্যকরী হয়। অল্পদিন মধ্যেই জীর্ণ ও বিগলিত হয় বলিয়া সূক্ষ্ম ধূলীবৎ চূর্ণের উপকারীতা শীঘ্রই উদ্ভিদগণ উপলব্ধি করে।* যাহাহউক, অস্থিসদৃশ স্থূল ও কঠিন পদার্থ যত বড় থাকে তাহার কার্য্যকারিতা তত কম দেখিতে পাওয়া যায়। সচারাচর বাজারে যে অস্থিচূর্ণ পাওয়া যায় তাহার আকার চিড়ে বা ধান্তের ন্যায় হইতে ধূলিবৎ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মোটা-দানা-চূর্ণের মূল্য সমধিক ছিল, অধিক কি ধূলার অপেক্ষা দ্বিগুণ ছিল। মূল্যের অল্পতা হেতু লোকে সূক্ষ্ম চূর্ণই ব্যবহার করিত এবং হাতে হাতে সুফল প্রাপ্ত হইত, অবশেষে সূক্ষ্ম চূর্ণের চাহিদা এতই বাড়িয়া গেল যে মোটা দানা ও সূক্ষ্ম দানার মূল্য সমান হইয়া গেল। মোটা দানার মূল্য হ্রাস হইল না, উপরন্তু সূক্ষ্ম চূর্ণের মূল্য বাড়িল। দ্বারভাঙ্গা রাজ-সরকারের উদ্যানাদির জন্য মোটা ও সরু, উভয়বিধ অস্থি চূর্ণ ক্রয় করিতাম এবং তখন সূক্ষ্মের মূল্য ২৫৲ টাকা এবং মোটা দানার মূল্য ৫০৲ হইতে ৫৫৲ টাকা (প্রতি টন = ২৭৷৷০ মণ) ছিল। অতঃপর দুই তিন বৎসর

---

* উদ্ভিদগণ যে 'উপলব্ধি' করিতে পারে, তাহা আর এক্ষণে উপেক্ষা করা যায় না। প্রাণী মাত্রেরই যেরূপ সুখ দুঃখ, আরাম অসুখ আছে; উদ্ভিদগণেরও সে সকল ঠিক সেই পরিমাণ আছে। সম্প্রতি প্রোফেসর জে, সি, বসু মহোদয় প্রেসিডেন্সি কলেজে—Plant autography সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে স্পষ্টই তাহা শ্রোতৃবর্গকে দেখাইয়াছেন। এক্ষণে আর উদ্ভিদকে অচৈতন্য পদার্থ বলা কোনমতেই চলেনা। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, উদ্ভিদের খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবার শক্তি আছে, বিষাক্ত বা অরুচিকর পদার্থ আহরণে অনিচ্ছাব্যঞ্জকতা ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য আছে।

পরে ক্রয়কালে দেখা যায় যে, মোটা দানার মূল্য পূর্ব্ববৎ আছে কিন্তু ধূলার মূল্য ২৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ফলকরের—বিশেষতঃ আম্র বৃক্ষের জন্ম প্রায় মোটা সার, আর সবজীবাগে বা কৃষিক্ষেত্রে সূক্ষ্ম গুড়া ব্যবহার করিতাম। সকল সারেরই স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা অনুসারে ফসলের যে ইতরবিশেষ হইয়া থাকে তাহা প্রস্তাবান্তরে আলোচিত হইবে।

ফস্‌ফরিক অম্ল।—ফস্‌ফেট্ যে কেবল জীবদিগের কঙ্কাল মধ্যেই পাওয়া যায়, তাহা নহে। ইদানীং ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় যেরূপ অপরিমিত ফস্‌ফেটিক সার ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে মাত্র জীব-কঙ্কালের উপর নির্ভর করিলে চলে না, কারণ তাহাতে সঙ্কুলান হয় না। ভূগর্ভ ও পাহাড়ের অনেক স্থলে (Phosphate of calcium) নামে এক জাতীয় ফস্‌ফেট্ পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত য়্যালুমিনম্, লৌহ, লৌহসংশ্লিষ্ট পদার্থেও ফস্‌ফেট্ থাকে। এই সকল দ্রব্যকে আহরণ করতঃ বিধিমত শোধন করিলে ফস্‌ফেটিক সার—সুপার-ফস্‌ফেট উৎপন্ন হয়, কারণ এ সকলের মধ্যেও অল্পাধিক সার থাকে। কৃত্রিম উপায়ে ফস্‌ফরিক অম্ল প্রস্তুত করিতে হইলে একখণ্ড ফস্‌ফরসকে একটী জলপূর্ণ পাত্রে (রেকাব, কাঁশি বা ডিস্ হইলে চলিতে পারে) ছাড়িয়া দিলে উহা ভাসিতে থাকিবে। অতঃপর সেই ফস্‌ফরস খণ্ডে অগ্নি সংযুক্ত করিলে তাহা জ্বলিতে থাকিবে। এক্ষণে প্রজ্জ্বলিত ফস্‌ফরসের উপরে একটী গেলাস, বাটী বা অপর কোন পাত্র সংস্থাপিত করিলে অর্থাৎ ভাসমান জ্বলন্ত ফস্‌ফরসকে ঢাকিয়া দিলে তাবৎ ধূম উদ্গামী হইতে না পারিয়া আবরণ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমে পাত্রস্থিত জলের সহিত মিশিয়া যায়। এক্ষণে জলের স্বাদ অম্লাক্ত হয়। উক্ত

জলকে তরল ফস্‌ফরিক-অম্ল কহে। অনন্তর সেই অম্লাক্ত জলকে অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া শুষ্ক করিলে যে ঘন (solid) পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা সাবয়ব ফস্‌ফরিক অম্ল (Phosphoric acid)। ফস্‌ফেটিক সার এতদবস্থায় পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হয় না। কাঁচা বা আভাঙ্গা (raw) সামগ্রীকে সংশোধিত না করিয়া মৃত্তিকাসংলগ্ন করিলে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইতে বহু বিলম্ব হয়। এতদবস্থায় ভূমিসংলগ্ন হইলে কাঁচা দৃঢ় সামগ্রীকে অনেকগুলি প্রাকৃতিক ও ভৌতিক অবস্থার ভিতর দিয়া আসিতে হয় এবং অনেকগুলি পদার্থের সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়। উদ্ভিজ্জ, রস ও উত্তাপ—এই কয়টী পদার্থের সাহায্য পাইলে তবে কাঁচা অস্থি বা অপর ফস্‌ফেটিক পদার্থ দ্রবীভূত হয়। শোধিত ফসফেট্—অস্থিজাত হউক বা ভূমিজ হউক,—ব্যবহার করিলে আশু ফল পাওয়া যায়। অম্লজান (Oxygen), জলজান (Hydrogen) ও ফস্‌ফরস—এই তিন পদার্থের সমাবেশফলে ফস্‌ফরিক অম্লের উৎপত্তি।

সুপার বা সুপার-ফসফেট।—ফস্‌ফেট্ সম্পর্কীয় পদার্থবিশেষকে গন্ধকাম্ল বা দাহজল (Sulphuric acid) সহযোগে শোধন করিলে 'সুপার-ফস্‌ফেট্' উৎপন্ন হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত নাম—সুপার। অস্থি, অস্থিজাত কয়লা ও মৃত্তিকাসম্ভূত (Earthy) বস্তু হইতে উল্লিখিত প্রক্রিয়ানুসারে সুপার প্রস্তুত হইয়া থাকে। গন্ধকাম্লের জারকতা শক্তির আত্যন্তিকতাহেতু যে কোন দ্রব্যই স্বল্পক্ষণ মধ্যে জীর্ণ হইয়া পড়ে এবং শোধন প্রক্রিয়াধীন বস্তুর অন্তর্গত জটিল অর্থাৎ সংযুক্ত পদার্থগণও বিচ্ছিন্ন ও আল্‌গা হইয়া পড়ে। এইজন্য জারিত ফস্‌ফেট্ স্বয়ং স্বতন্ত্র পদার্থে পরিণত হইয়া তৎপর কার্য্যকরী হইয়া উঠে। আশু ফললাভের জন্য সুপার

ব্যবহার করিলে অনেক বিষয়ে সাশ্রয় হয়। আভাঙ্গা (raw) সামগ্রী, কি অস্থি চূর্ণ বা কি অপর পদার্থ—ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে বিগলিত হইতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়, তন্নিবন্ধন গলনাবস্থায় কতক সারাংশের অপচয় হয়।

কলিকাতা ও উপকণ্ঠে কোন কোন কারখানায় (Mill) অস্থি চূর্ণ প্রস্তুত হয়। বেঙ্গল ফার্মসিউটীক্যাল্ ও ওয়ান্ডী সাহেবের রসায়ানিক কারখানাতে সুপার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প থাকিলে পাঠকগণ উল্লিখিত কোন কারখানায় অনু-সন্ধান করিতে পারেন। ফস্ফরিক্ সার কিছু মূল্যবান বটে, কিন্তু তেমনি অল্প সারে সমধিক ফল পাওয়া যায়। সাধারণ জমিতে আলু শালগম, বীট, গাজর প্রভৃতি মূলজ বা অন্তর্ভৌমিক ফসল মধ্যে পৌণে দুই মণ হইতে দুই মণ সার প্রতি বিঘায় দিলে চলিতে পারে কিন্তু গোধূম বা দাল কড়াই বা ইক্ষুর ক্ষেত্রে কিছু অধিক দিতে হয়। যে ফসল যে দ্রব্য যে পরিমাণে আহার করে, তাহাকে তাহাই দেওয়া উচিত। যদিও উপরে কয়টী মাত্র ফসলের নামোল্লেখ করা গেল, কিন্তু তাহা বলিয়া এমন কেহ মনে করিবেন না যে, অপরাপর ফল ফুল বা অন্য ফসলে তাহা অদেয়। উদ্ভিদ মাত্রেরই ইহা একটী বিশেষ উপযোগী ও অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সুতরাং সকল উদ্ভিদকেই দেওয়া কর্ত্তব্য, তবে উদ্ভিদবিশেষে প্রয়োজনের ইতরবিশেষ বুঝিয়া এবং ভূমির অবস্থা বিচার করিয়া পরিমাণের তারতম্য করা উচিত।

যে ক্ষেত্রে ফস্ফেটের অভাব তজ্জাত ফসলের ফলন তাদৃশ আশাজনক হয় না, অনেক সময় নৈরাশ্য উৎপাদক হয়। ঈদৃশ ক্ষেত্রজাত ফসল নয়নরঞ্জক হইতে পারে, গাছ বাড়ন্ত ও সুশ্রী

হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের কঙ্কাল দৃঢ় হয় না, সুতরাং ফসল অধিক হয় না, ফসলের শস্যাদি তাদৃশ পরিপুষ্ট হইতে পারে না। ফস্‌ফেটশূন্য ক্ষেত্রে আলুর আবাদ করিলে সোরাজান প্রভাবে হয় ত গাছ খুব ঝাড়াল ও ঘনবর্ণ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে আলু অধিক জন্মে না, আলুর শস্যে তেজস্কর পদার্থের অভাব থাকে। ঈদৃশ ফসল রসপ্রধান হয় সুতরাং তদ্দ্বারা জীবেরও যথোচিত পরিপুষ্ট হয় না। অধিক কি, ইহা অস্থি-মজ্জাদির শক্তিসঞ্চারক। আলু সম্বন্ধে যে কথা বলা গেল, সকল ফসলেরই ফস্ফেট অভাবে ঐ দশা ঘটে। ফস্ফেটের কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে একটী প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিতেছি। রাজ-দ্বারভাঙ্গার অনেকগুলি বিস্তৃত ফলকর-বাগান আছে, তাহাদিগের মধ্যে একটী 'কলম-বাগ' নামে অভিহিত। ইহার আয়তন নূন্যাধিক ১০০ বিঘা হইবে এবং তাহা আম্র-বৃক্ষে পূর্ণ। সেই বাগান ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ণ-যৌবন-প্রাপ্ত সুদর্শন, সুঠাম পাঁচশত উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্রে পূর্ণ! যে সময়ের উল্লেখ করিতেছি সে প্রায় ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বাগানের সূত্রপাত হইতে সে নাগাদ কখনও তাহাতে ফল হয় নাই। যে বৎসরের কথা বলিতেছি (ইং ১৯০০ সাল) সে বৎসর গ্রীষ্মকালে গিয়া দেখি যে, অত বড় বিস্তীর্ণ বাগানে মাত্র বারোটী কি তেরটী আম্র ফলিয়াছে। মনে রাখিবেন যে, উহা ফলের সংখ্যা, গাছের সংখ্যা নহে। বাগানখানির ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে নিতান্ত যে ব্যথিত হইতে হইয়াছিল তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন। যাহা হউক, উদ্যানের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকা অপেক্ষা তাহার প্রতিবিধানে যত্ন করাই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া সেই বিস্তৃত ভূখণ্ডকে জঙ্গলবিমুক্ত করিবার পর উত্তমরূপে হল

চালানাদি দ্বারা কার্য্যের প্রথম অঙ্ক শেষ করা যায়। অতঃপর, আষাঢ় মাসের প্রাক্কালেই প্রত্যেক বৃক্ষের ছায়া পরিমিত স্থানে চক্রাকার চিহ্ন দেওয়া যায় এবং প্রত্যেক চক্রের উপরে প্রায় পাঁচ সের হিসাবে অস্থিচূর্ণ প্রসারিত করিয়া দিবার পর উহাকে মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার জন্য সেই চক্র মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহকে উত্তম-রূপে কুদ্দালিত করিয়া দেওয়া যায়। ইহাই হইল শেষ অঙ্ক। এক্ষণ হইতে সে বাগানে আর কোন পরিচর্য্যা করা হয় নাই, তবে বৃক্ষের তলদেশ তৃণময় হইয়া পড়িলে লঘুভাবে কুদ্দালিত করিয়া দেওয়া হইত। বলা বাহুল্য যে, কার্য্যারম্ভকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাট-পরিচর্য্যা করিতে অর্থব্যয় হইয়াছিল, মজুরীও যথেষ্ট পড়িয়াছিল। ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য যে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলাম তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মাঘ-মাসে সেই ঔৎসুক্যের মাত্রা বড় অধিক হইয়াছিল কারণ বৃক্ষগুলি মুকুলিত বা মুঞ্জরিত হইবার ইহাই সময়। দেখিতে দেখিতে বৃক্ষগুলি—প্রত্যেক বৃক্ষ—এরূপ মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল যে তদ্দর্শনে একবারে বিহ্বল হইতে হইয়াছিল। অতঃপর যথাসময়ে বৃক্ষগুলি ফলভরে অবনত-প্রায় হইল। জ্যৈষ্ঠমাসে ফলগুলি বড় বড় হইয়া উঠিলে ফলের একটা আন্দাজ করিবার জন্য 'কুৎ' বা সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়। ইহাতে দেখা গেল যে, সে বৎসর লক্ষাধিক আম্র ফলিয়াছিল! সেই বৎসর হইতে গ্রন্থকার তথায় যতদিন ছিলেন, প্রতি বৎসর যেরূপ পাট-পরিচর্য্যা হইত, তেমনি অপর্য্যাপ্ত ফলও জন্মিত। পাট-পরিচর্য্যায় মধ্যে কিছু ভেদাভেদ করা হইত, অহা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য নহে। এই ঘটনাটী বিস্তৃতভাবে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ফস্ফরিক-সার ব্যবহারের কৃতকার্য্যতা কত

তাহা প্রদর্শন করা। এ ক্ষেত্রে যে সার ব্যবহার করা গিয়াছিল, তাহা সূক্ষ্ম অস্থিচূর্ণ। সার প্রদানের কাল হইতে বৃক্ষগণের মুঞ্জরিত হইবার কাল পর্য্যন্ত প্রায় সাতমাস সময় পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ব্যতীত উহার মধ্যে কয়মাস বর্ষাকালও পাওয়া গিয়াছিল, সুতরাং অস্থিচূর্ণ বিললিত হইবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছিল এবং সময়ের দীর্ঘতাহেতু তাহার ফল উদ্ভিদগণ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার অবসর পাইয়াছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অস্থি-চূর্ণ প্রয়োগফলে কেবল যে ফলের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল তাহা নহে, ফলের আকার পূর্ণ ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন উহার মূল্যও অধিক হইয়াছিল। অস্থিচূর্ণ ব্যবহারে যে আশাতীত সুফল লাভ করিয়াছি বিশদরূপে তাহার আলোচনা করিতে গেলে কেবল তাহাতেই একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে, তাহা ব্যতীত সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব কিছু রাখি নাই। তরিতরকারী উৎপাদনের জন্য সব্জীক্ষেত্রে ইহার প্রভূত ব্যবহার ছিল এবং তাহার ফলে তথায় শীতকালের যে নানাবিধ আনাজ-বনাজ উৎপন্ন হইত বাস্তবিক তাহা বিস্ময়কর! ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু প্রভৃতি দেখিয়া দর্শকমাত্রেই মোহিত হইত! কতকগুলি মৃত-প্রায়, ফলতঃ পরিত্যক্ত, লেবুগাছে অস্থিচূর্ণ প্রদান করায় সম্বৎসর মধ্যে সেই সকল বৃক্ষ একদিকে নব নব শাখাপ্রশাখায় যেরূপ সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে সেইরূপ বহু ও উত্তম ফল প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে কত বৃক্ষলতাদির জীবন রক্ষিত হইয়াছিল, কত মড়াঞ্চে গাছ পুনরায় ফলবন্ত হইয়াছিল তাহার আর কত উল্লেখ করিব? অবশ্য, প্রথম বৎসর সেই সার কলিকাতা হইতে রাজনগরে লইয়া যাইতে যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছিল

কিন্তু লভ্যাংশের সহিত ব্যয়ের আনুপাতিক তুলনা করিলে ব্যয়কে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হইত। এ স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করি যে, উদ্যান বা ক্ষেতখামার-জাত প্রায় তাবৎ ফসলই সাধারণ্যে বিক্রিত হইত। অতঃপর সেই অর্থ হইতেই সার ক্রয় করা হইত! প্রথম বৎসর চারি টন (১১০/০ মণ) অস্থিচূর্ণ ৫০৲ হিসাবে খরিদ হয়। পথ খরচাদিতে আরও ২০।৩০ টাকা খরচ হইয়াছিল। সেই বৎসর মাত্র আম্র ফসল বিক্রয় করিয়া প্রায় ২০০০৲ দুই সহস্র টাকা আদায় হইয়াছিল! নিকটে সহর থাকিলে কিম্বা স্থানান্তরে চালান করিবার সুযোগ থাকিলে লভ্যাংশ যে আরও অধিক হইত তাহা সুনিশ্চিত। এতদ্ব্যতীত বহু আম্র নষ্টও হইয়াছিল।

সোরাজান দ্বারা উদ্ভিদের পরিপুষ্টি সাধিত হয় কিন্তু আভ্যান্তরিক শক্তির অভাবে স্থূলতার কোন ফল নাই। ফস্‌ফেট বা ফসফরস্ অম্লে পরিণত হইলে তবেই উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই ফস্‌ফরিক অম্ল কি জীব, কি উদ্ভিদ, সকল শরীরেই শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকে। উক্ত শক্তিই জীবের জীবত্ব, উদ্ভিদের উদ্ভিদত্ব। আমরা বিশুদ্ধ সোরাজান কখনও ব্যবহার করি না। যে সকল সোরাজানসম্বলিত উদ্ভিদ-খাদ্য আমরা ব্যবহার করি, তৎসমুদায়ে প্রায় অল্লাধিক ফস্ফরিক অম্ল, পট্যাস প্রভৃতি থাকেই, এতন্নিবন্ধন সোরাজানিক সার হইতে উক্ত পদার্থসমূহ কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়।

পট্যাস (Potash)—মাটিতে পট্যাস থাকিবার ফল এই যে, গাছ সকল দৃঢ় হয়, প্রবল বাতাস সহ্য করিতে পারে, তাহা ব্যতীত সহজে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। কোন

জিনিস ভস্মীভূত হইলে যে ছাই উৎপন্ন হয়, তাহাতেই পোটাস থাকে। কদলীবৃক্ষে সমূহপরিমাণে পট্যাস থাকিতে দেখা যায়। এই জন্য রজকগণ অপর ছাই অপেক্ষা কদলী বৃক্ষাবশিষ্ট ছাই সমধিক মূল্যবানবোধে তাহাই ব্যবহার করে। সকল উদ্ভিদের কোমল ও বর্দ্ধমান অংশ এবং শাখাপ্রশাখায় উপরিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পট্যাস থাকে কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে সে হিসাবে অতি অল্প থাকে। পট্যাস যে মাটির একটী উপাদান এবং উদ্ভিদের যে উহা একটী বিশেষ খাদ্য তাহা অনেকের জানা না থাকিলেও প্রকারান্তরে লোকে উহা বহুদিন হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কৃষকগণ ক্ষেত্রে ছাই দিয়া থাকে। অনেক গৃহস্থ-মহিলা জানেন যে, গাছের গোড়ায় ছাই দিলে, গাছ তেজাল হয়, গাছে গেঁড়ি বা সোঁয়া উঠিতে পারে না ইত্যাদি। গাছে বা ক্ষেত্রে ছাই প্রদান করিলে যে তাহাতে সোরাজান দেওয়া হয় না, তাহা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন করে না, কারণ দগ্ধীভূত হইলে প্রায় তাবৎ উদ্ভিজ্জ পদার্থ পুড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে তদন্তর্গত নাইট্রোজেনও বিমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যাহা অবশিষ্ট থাকে, তৎসমুদায় পট্যাসসম্বলিত নানাবিধ ধাতব পদার্থ মাত্র। উদ্ভিদবিশেষের ভস্ম মধ্যে শতকরা ২ হইতে ১৫ ভাগ পট্যাস বিদ্যমান। এতদ্দারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা ফসলের বিশেষ সহায়তা হয় না। কিন্তু মাটিতে উহার অস্তিত্ব না থাকিলে কোন ফসল সুচারুরূপে ফসল প্রদান করিতে পারে না।

ভূপৃষ্ঠ হইতে বহু পট্যাস বহির্গত হইয়া যাইতেছে, এজন্য উদ্ভিদের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে। উক্ত অভাব বিদূরিত করিয়া

মৃত্তিকার স্থায়ী শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। ক্ষেত্রে পট্যাস প্রদান করিবার ইহাই উদ্দেশ্য। ধান্য, গোধূমাদির ক্ষেত্রে পট্যাসের অভাব থাকিলে সেই সকল ফসলের কাণ্ড হেলিয়া পড়ে, শীর্ষদেশে যে শস্য জন্মে, তাহা দৃঢ়তার অভাবে স্খলিত হইয়া পড়ে, শীর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

মাত্র পট্যাস দ্বারা উদ্ভিদের বিশেষ উপকার জানিতে পারা যায় না তাহার উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু অপরাপর অর্থাৎ ফসফেটিক সারের সহিত সম্মিলিত ভাবে প্রদত্ত হইলে হইলে উদ্ভিদের বিশেষ উপকার দর্শে। এ স্থলে পট্যাসের উপকারীতা সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিব, তাহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, পট্যাস কত মূল্যবান সামগ্রী। রাজনগরের সুবিস্তীর্ণ ফলের বাগানে এক অংশে শতাধিক লিচুগাছ ছিল, কিন্তু গাছগুলির তেমন শ্রী ছিলনা, বেশী ফল ধারণও করিত না অথচ তাহাদিগের সমবয়স্ক আরও কতকগুলি লিচুগাছ তৎসংলগ্ন ক্ষেত্রে থাকিয়া যেমন সুঠাম ও প্রসারিত বৃক্ষ হইয়াছিল তেমনি যথেষ্ট পরিমাণে ফলও প্রদান করিত। এক বৎসর পূর্ব্বোক্ত লিচুগাছে অস্থিচূর্ণ দিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। পর বৎসর প্রত্যেক বৃক্ষের তলায় ২ ৩টী কদলীবৃক্ষ টুকরা টুকরা কর্ত্তন করিয়া প্রসারিতকরতঃ কুদ্দাল দ্বারা জমির পাট করা যায়। ইহার ৩।৪ মাস পরে গাছের চেহারা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। গাছের সে বিবর্ণতা বিদূরিত হইতে লাগিল দেখিয়া আর একবার উক্ত প্রণালীতে কদলী বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া দেওয়া যায়। এক্ষণে সে মরণোন্মুখ দশা দূর হওয়ায় তাহারা সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইয়া উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি

করিতেছে এবং যথেষ্ট ফল প্রদান করিয়া উদ্যানস্বামীর চিত্ত-বিনোদন করিতেছে। স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি যে, তাবৎ গাছের পাতা লতা প্রভৃতিকে নষ্ট হইতে না দিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করতঃ মাটির সহিত থাকিতে দিলে তাহা হইতে মাটিতে পট্যাস সঞ্চিত হয়। এ সকল উপায়ে অল্পসার পাওয়া যায়, কিন্তু আসল সামগ্রী দিলে অধিক ও শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। তবে বৃথা নষ্ট না করিয়া ভূমির সামগ্রী ভূমিতে প্রত্যর্পণ করিলে উপকারই হয়, তাহাতে সংশয় নাই।

লোমশ পশু—ছাগ ও মেষদিগের গাত্রে যথেষ্ট পরিমাণে পট্যাস থাকে। উহারা যাহা কিছু আহার করে তদন্তর্গত পট্যাস উদরপ্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে শোণিত প্রবাহের ভিতর দিয়া ঘর্ম্মরূপে লোমকূপ দ্বারা বহির্গত হয়। কিন্তু উহাঁদিগের শরীর লোমদ্বারা আবৃত থাকায় উক্ত পট্যাস লোমে আবদ্ধ থাকে। এই সকল পশুচর্ম্ম ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে চর্ম্মধৌত জল বা চর্ম্মের ধূলা সংগ্রহ করিতে পারিলে যথেষ্ট পট্যাস্ সংগৃহীত হইতে পারে। উহার গুঁড়াকে 'চামনিমক' কহে এবং সাররূপে বিশেষ ফলপ্রদ। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় লোমশ-চর্ম্মের ব্যবসায়ীগণ উক্ত চর্ম্ম নিস্ক্রান্ত ধূলা ও জল বিক্রয় করিয়া প্রতিবৎসর প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে কিন্তু এদেশে তাহার কোন উপায় হয় না।

সকল উদ্ভিদই পট্যাস আহরণ করে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে গোধূম, আলু, সিম্বীক উদ্ভিদ প্রভৃতি কতকগুলি ফসল উক্ত পদার্থ অধিক পরিমাণে আহরণ করিয়া থাকে। উক্ত পদার্থ মাত্র ভূমি হইতেই সংগৃহীত হয়, কিন্তু নিত্য খরচ হইতে থাকায় প্রতিনিয়ত উহার পরিমাণ উপরিতন হইতে হ্রাস পাইতেছে। প্রোফেসর

স্যাকস্ (Professer Sachs) বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তাবৎ উদ্ভিদের পক্ষেই পোটাস্ এতই প্রয়োজনীয় যে, মাটিতে উহার অভাব থাকিলে তজ্জাত উদ্ভিদের পত্রসমূহে শ্বেতসার (Starch) জন্মিতে পারে না, কিন্তু শ্বেতসার না জন্মিলে গাছেরও বৃদ্ধি হয় না। শ্বেতসার যে উদ্ভিজ্জীবনের একটী প্রয়োজনীয় পদার্থ তাহা জানা উচিত। কোন কোন মৃত্তিকায় শতকরা দুইভাগ আবার কোন কোন স্থলে ইহাপেক্ষা অনেক কম থাকিতে দেখা যায়। জীবোদ্ভিদ নির্ব্বিশেষে সকলেরই খাদ্য দ্রব্যাদি ভূমণ্ডলময়—জলে, স্থলে ও ব্যোমে—প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে ভূমির মধ্যে যে সকল সামগ্রী আছে বা থাকে, সময়বিশেষে তাহাদিগেরই হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবাদ হইলেই ক্ষেত্র হইতে তদীয় নানা পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়। ফস্ফরিক অম্লের ন্যায় পট্যাসও সংযোজিত না হইলে অন্য উপায়ে তাহা পরিপূরিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, দৈবকারণে যাহা সংযোজিত হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য চলে না।

পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ক্ষেত্রে যে কোন পদার্থ প্রদান করিলেই যথেষ্ট হয় না, কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন ফসল কোন জিনিস অধিক, কোন জিনিস কম আহরণ করে। কেবল নাইট্রোজেন বা কেবল নাইট্রোজেন ও ফস্ফেট্ সার দিলে চলিতে পারে না, উদ্ভিদের তৃতীয় খাদ্য পট্যাসও সেই সঙ্গে দিতে হইবে কিন্তু দেখিতে হইবে যে, উক্ত পদার্থসমূহ কি পরিমাণে মৃত্তিকায় বিদ্যমান। আরোরুট ও আলুর মধ্যে শ্বেতসারের পরিমাণ অধিক থাকে ইহা আমরা অবগত আছি যে ভূমিতে ইহাদিগের আবাদ হয়, তাহাতে পট্যাসের অভাব থাকিলে

আলু বা আরারুট মধ্যে শ্বেতসারের অভাব হইবে, ফলতঃ আলু ছোট হইবে, অল্প হইবে এবং বিস্বাদ হইবে। এইরূপ সকল পদার্থ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

মাটিতে পট্যাসের অস্তিত্ব পরীক্ষা করিতে হইলে ঈষৎ মাটিকে লিট্‌মস্ কাগজ দ্বারা চাপিয়া ধরিতে হয়। এতদ্দ্বারা লিট্‌মস্ কাগজে সবুজ দাগ ধরিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মাটিতে পট্যাস্ বিদ্যমান আছে। উক্ত সবুজ দাগের গাঢ়তা বা লঘুতা দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মাটিতে উক্ত পদার্থের আন্দাজ পরিমাণ কত।*

পট্যাসের অভাব থাকিলে আদৌ দাগ লাগিবে না। মাটিতে চূণ আছে কিনা, কিম্বা কি পরিমাণ আছে—তাহাও উক্ত কাগজ দ্বারা উল্লিখিত উপায়ে মোটামুটি নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। লিট্‌মস্ কাগজে লাল বা গোলাপী দাগ লাগিলে বুঝা যাইবে যে, মাটিতে চূণ আছে। অধিক চূণ থাকিলে গাঢ় এবং অল্প থাকিলে ফিকে দাগ লাগিবে। বিশেষ পরীক্ষা করিতে হইলে মৃত্তিকার বিশ্লেষণ (Analysis) করা কর্ত্তব্য। এতদর্থে কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লওয়া উচিত।

যাহা হউক, আমরা বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখিতেছি যে, পট্যাস্‌কে সাক্ষাৎ উদ্ভিদখাদ্য মনে না করিয়া পরোক্ষ বা তরকারীর মসলারূপে ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ অপর উদ্ভিদখাদ্য—নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফেটের সহিত যথাপরিমাণে ব্যবহার করিলে সমূহ উপকার পাওয়া যায়, মাত্র পট্যাস বা ভস্ম ব্যবহারে বিশেষ ফল নাই।

ক্ষেত্রে ভস্ম প্রসারিত করিলে কিছু পট্যাস দেওয়া হয় কিন্তু

* লিটমস্ কাগজ, (Litmus paper) স্মিথ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট, ব্যাথগেট কোং প্রভৃতি বড় বড় ঔষধালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।০ আনা।

কোন্ ভস্মে কি পরিমাণ পট্যাস তাহা জানা না থাকিলে উহা ব্যবহার করা কঠিন। কতকগুলি ছাই দিলে মাটি অতিশয় আল্গা হইয়া যায়, মাটির রসধারকতা ও শোষকতাশক্তি হ্রাস পায়। মোট কথা, মাটির প্রকৃতি—ভস্মের পরিমাণানুসারে—পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এজন্য অবিমৃষ্যভাবে ভস্ম ব্যবহার করা সমীচিন নহে। জমির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত না হয় অথচ যথাযোগ্য পরিমাণে পট্যাস্ দেওয়া চলিতে পারে, এজন্য সমাবিষ্ট বা শোধিত (Concentrated বা Chemical) পট্যাস ব্যবহার করা উচিত। ঈদৃশ সারের বিশেষত্ব এই যে, অল্প ব্যবহারে সমধিক ফল পাওয়া যায়, কারণ ইহার মধ্যে অপর বাজে জিনিস অধিক থাকিতে পায় না, রাসায়নিক কৌশলে তাবৎ বাজে জিনিসকে বহির্গত করিয়া লওয়া হয়। উক্ত শোধিত পট্যাস আজকাল জার্ম্মেনি অন্তর্গত ষ্টাস্ফর্ট (Stassfurt) হইতে এ দেশে ও অপর বহু দেশে প্রেরিত হইতেছে।*

পট্যাসিক-পদার্থ অনেক উদ্ভিজ্জসারে, বিশেষতঃ নানা জাতীয় খৈলে, এবং গবাদি পশুর গোময় মধ্যে, অল্লাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত, ভূগর্ভেও স্বভাবতঃ অল্পবিস্তর অবস্থিত, এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের ক্ষেত্রের পট্যাসের অভাব সচরাচর কতকটা বিমোচিত হয়, সুতরাং কৃত্রিম পট্যাস্ ব্যবহার করিবার তত প্রয়োজন হয় না। আর এক কথা এই যে, পটাস্ ব্যবহার মাত্রেই যে ফসলের উপকার হইবে, এরূপ দেখা যায় না, কারণ মাটির বিশেষত্বানুসারে ইহার ফলাফল নির্ভর করে। লঘু বেলে জমিতে

* উক্ত পট্যাস প্রাপ্তির ঠিকানা—Schroder, Smidt, & Co., Calcutta.

কিম্বা বোদা মাটিতে পট্যাসিক-সার সংযোজিত হইলে যত উপকার পাওয়া যায়, গুরুভার আটাল জমিতে তেমন পাওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত জমিতে সাধারণতঃ পট্যাসের ভাগ বড় কম থাকে, কিন্তু শেষোক্ত মাটিতে ইহার প্রাচুর্য্যবশতঃ সাধারণ ফসলের জন্য প্রায় পট্যাস প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। মিশ্রসার ব্যবহারকারীদিগকে তৎসম্বন্ধে অধিক বিবেচনা করিতে হয় না, কিন্তু কৃত্রিম পট্যাস-সার বা পট্যাস-প্রধান-সার—মিউরিয়েট বা সল্‌ফেট্‌-অব-পট্যাস—সাধারণ ভাবে ক্ষেত্রে প্রদান করিতে হইলে ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে পরীক্ষার্থে কোন কোন ফসলে ব্যবহার করিয়া দেখা উচিত। এরূপ করিলে অপচয় বা অপব্যবহার হয় না। অতঃপর ইহাও দেখা যায়, কোন কোন ফসল সমধিক পট্যাস্ আহরণ করে সুতরাং তাহাদিগের প্রয়োজনমত তাহাদিগকে উক্ত দ্রব্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হইবে। আলু, পট্যাস-বহুল খাদ্যের বিশেষ প্রয়াসী, তাহা বলিয়া মৃত্তিকানির্ব্বিশেষে সকল স্থলেই যে আলুর ফসলে সমূহ পরিমাণে পট্যাস প্রদান করিতে হইবে, তাহা নহে।

উদ্ভিজ্জ ভস্ম।—উদ্ভিজ্জ-ভস্ম পট্যাসের একটী বিশেষ আধার সুতরাং কোন মতে অপচয় হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ভূমিতে সোরাজান সংগৃহীত হইবার অনেক উপায় আছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু মৌলিক পদার্থকে ক্ষেত্র হইতে অপহৃত হইতে দিলে নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় হয়। যে কোন বস্তু দগ্ধীভূত হউক, তাহাতে মৌলিক পদার্থের সঙ্কোচ বা বিলোপ হয় না। ভস্মমধ্যে তাবৎ মৌলিক ধাতবপদার্থই বিদ্যমান থাকে। পট্যাস দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি বা ফসলের ফলন-বৃদ্ধি সাক্ষাদ্ভাবে না হইতে

পারে কিন্তু তৎসহযোগে উদ্ভিদগণ দৃঢ় ও কষ্টসহ হয়, ফলধারণে সক্ষম হয়। সাক্ষাৎভাবে পট্যাস তত প্রয়োজনীয় না হইলেও অন্য হিসাবে উহা দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলনফুলনের বিশেষ সহায়ক সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। উদ্ভিদের কোমলাংশে ও ফলফুলে কত পট্যাস্ থাকে, তাহার আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, উক্ত পদার্থ উদ্ভিদের কত প্রয়োজনীয় খাদ্য। নানাবিধ পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদগণ কত উপকার লাভ করে তাহার সকলই কি আমরা জানি, না জানিবার উপায় আছে? প্রাণী হউক বা উদ্ভিদ হউক, কেহ কোন দ্রব্য বিনা কারণে আহরণ করে না। প্রকৃতপক্ষে আমরা সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ মানব হইয়াও বলিতে পারি না যে, আমরা শরীরধারণার্থ কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আহরণ করি। আমাদিগের পক্ষে কোন্টী প্রয়োজনীয়, কোন্টী অপ্রয়োজনীয় তাহাই আমরা এখনও জানিতে পারি নাই, অথচ আমরা বহুকাল হইতে বাঁচিয়া আছি। এজন্য বলিতেছি যে, সকলেরই শরীরে নানা দ্রব্য অজ্ঞাতসারে আহরিত হয়। আহ-রণের মালিক—জীবনীশক্তি, এবং সেই জীবনীশক্তিই জানে,—শরীর ধারণের জন্য কোন্ কোন্ সামগ্রীর প্রয়োজন এবং তাহাই সে আহরণ করে, ইহাতে আমাদিগের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহা আমাদিগের ইচ্ছার অগোচর, জ্ঞানের সীমা বহির্গত। পানাহার না করিলে আমরা বাঁচিতে পারি না বলিয়াই পানাহার করি। প্রকৃতিগত সংস্কারই ইহার মূল নহে কি? আমরা পানাহারকালে ভাবিতে পারি না, কিম্বা মনে করি না যে, যে দ্রব্য আমরা পান বা ভোজন করি তন্মধ্যে পট্যাস আছে কি না, অথবা যদি থাকে তবে কি পরিমাণ আছে, অথচ নানা খাদ্যাদি

সহযোগে উহা আমরা নিত্যই আহরণ করিতেছি। এ সকল সত্ত্বেও সময়ে সময়ে আমাদিগের শরীরে পট্যাসের সমূহ অভাব পরিলক্ষিত হয়। শরীর মধ্যে পট্যাসের অভাব হইলে আমরা ব্যাধিগ্রস্ত হই। সকল সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না যে, ব্যাধির কারণ কি? আজকালের চিকিৎসকদিগের মত এই যে, শরীর মধ্যে পট্যাসের অভাব হইলে ক্যান্‌সার (cancer) রোগ জন্মে। পট্যাসহীন ক্ষেত্রে ধান্য বা গোধূমের আবাদ করিলে দেখা যাইবে, গাছ সকল পট্যাসের অভাবে খাড়াভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিতেছে না। এ ছাড়া শরীর গঠনের একটী বিশিষ্ট উপাদানের অভাব হেতু উহাদিগের বৃদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইবে এবং তাহার অনিবার্য্যফলে ফলফুলের অভাব হইবে ইহা সুনিশ্চিত। শোষিত বা চুয়ানো জল একটী শিশি বা বোতল মধ্যে পূরিয়া তাহাতে কোন গাছ রাখিলে গাছটী বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু তাহা অল্পদিনের জন্য, এবং তাহাতে ফলফুল উৎপন্ন হইবে না। উক্ত প্রণালীকে water culture কহে।

বিনা পট্যাসে উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গত বৎসর আমি কয়েকটী ক্ষুদ্র চারা লইয়া উল্লিখিত প্রণালীতে পালন করিয়াছিলাম। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, প্রথমাবস্থায় উহারা ২।১ সপ্তাহ বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সে বৃদ্ধিতে তাহাদিগের শরীরে উদ্ভিজ্জ পদার্থের বৃদ্ধি হয় না অথচ গাছ দীর্ঘ হইয়া ক্রমে ঝুলিয়া পড়ে। তাহা ব্যতীত, শীর্ণ হইয়া অবশেষে সমুদায় অঙ্গ পাংশুবর্ণ প্রাপ্ত হয়। বীজ ও জলের মধ্যে অজ্ঞাতভাবে যে সামান্য পরিমাণ পট্যাস বিদ্যমান থাকে, নবজাত উদ্ভিদ আপাততঃ তাহা আহরণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু তাহা নিঃশে-

ষিত হইলে উদ্ভিদের আর বর্দ্ধিত হইবার সামর্থ্য থাকে না। পাঠক অবগত আছেন যে, উদ্ভিদগণ যে কিছু পদার্থ, ভূমি হইতে হউক বা বায়ুমণ্ডল হইতে হউক, আহরণ করে, তৎসমুদায় কোমলপত্র ও শাখাপ্রশাখার কোমলাংশে আপাততঃ গিয়া স্থান পায়। অতঃপর তথায় সর্ব্বাগ্রে পত্রহরিৎ (chlorophyl) প্রস্তুত হয়, শর্করা ও শ্বেতসার (starch) তাহার পর। পত্রহরিৎ উৎপন্ন হইবার প্রধান উপকরণ—পট্যাস। ইহার অভাবে পত্রহরিৎ উৎপন্ন হইতে পারে না, কাজেই গাছ বাড়িতে পারে না, ফল-ফুল হওয়াত দূরের কথা। এতদ্দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হয় যে, উদ্ভিদের পট্যাস্ না হইলে চলে না। মাটিতে উহা না থাকিলে অথবা উহার পরিমাণ হ্রাস পাইলে পট্যাস্ জাতীয় সার প্রদান করিতেই হইবে।

চূণ (**Lime**)।—পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কৃষিকার্য্যে চূণের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়। এক পক্ষের মত এই যে, উহা প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদখাদ্য নহে, ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইলে, ভৌতিকতানিবন্ধন মৃত্তিকান্তর্গত পদার্থ-নিচয়কে, বিশেষতঃ জৈব পদার্থকে, শীঘ্র জীর্ণ করিয়া দিয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়। অতিরিক্ত পরিমাণে জৈব পদার্থের সংযোগে অথবা সোরাজানিক পদার্থের আধিক্য হেতু মাটি অম্লাক্ত হইয়া পড়িলে চূণ প্রয়োগে উক্ত দোষ ক্ষালিত হয়। এতদ্ব্যতীত, তাঁহারা আরও বলেন যে, এতদ্দ্বারা ভূম্যান্তর্গত সোরাজান তিরোহিত হইয়া মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, মৃত্তিকা নিঃসার হয়, এবং বারংবার ও ঘন ঘন প্রয়োগে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি একবারে বিনষ্ট হয়। আপাততঃ চূণ দ্বারা অধিক ফসল উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ভূমির প্রকৃত শক্তি বিলুপ্ত হয়,

এই ভয়ে তাঁহারা চুণ ব্যবহারে বড় একটা পরামর্শ দিতে চাহেন না। অপর পক্ষের মত অন্যরূপ। ইঁহারা বলেন যে তাহা নহে, অপরাপর সামগ্রীর ন্যায় চুণও উদ্ভিদের খাদ্য। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে, চূণ, তীব্রতাগুণে, মৃত্তিকাপ্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় কিন্তু তাহা হইলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। আরও এক কথা এই যে, ক্ষেত্রে সহজে চুণ দিবার প্রয়োজন হয় না এবং ঘন ঘন দিবারও কখন আবশ্যক হয় না। অতিশয় কোন জিনিষের ভাল নহে। চুণ প্রয়োগ করিতে হইলে উত্তাপ বিবর্জ্জিত চূণ ব্যবহার করা উচিত, এবং তাহাও অতি অল্প পরিমাণে।

সকল মাটিতেই চুণ আছে কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি সামান্য এবং উত্তাপবিগর্হিত। তাহা ব্যতীত, সকল উদ্ভিদ মধ্যেই অল্পাধিক চুণ থাকিতে দেখা যায় এবং কোন উদ্ভিদকে বিশ্লেষণ করিলে তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। উদ্ভিদশরীরে যখন চূণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উদ্ভিদ যে তাহা মূল দ্বারা আহরণ করে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মনুষ্যাদি জীব মধ্যে চুণ আছে এবং অস্থি মধ্যেই চুণের প্রাধান্য অধিক। কাঠাম (Skeleton) গঠনের নিমিত্ত চূণ একটী বিশেষ উপাদান সুতরাং উহাকে কাঠাম-নির্ম্মাণক বা (Skeleton builder) বলিলে ক্ষতি হয় না। উদ্ভিদবিশেষে ৫.৬ ভাগ হইতে ৪০ ভাগের অধিক চুণ থাকিতে দেখা যায়। গ্রিফিথ্ সাহেবের বিশ্লেষণ-ফল পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, মাটিতে চূণ থাকা কত প্রয়োজন।*

---

* Griffiths Treatise on Manures. p. 237.

Mangel wurzel (root)	(বীট বিশেষের মূল)	শতকরা	১৩৷৬২	ভাগ
Meadow hay	(মেঠো ঘাস)	„	১৮৷৩১	„
Bean ...	(শীম) ...	„	৭৷১২	„
Cabbages ...	(বাঁধাকপি)	„	১৫.৬৬	„
Wheat (grain)	(গোধূম শস্য)	„	১০৷৬৬	„
Turnip (roots)	(শালগম মূল) ...	„	১৩৷০২	„
„ (leaves)	(ঐ পাতা) ...	„	৩৫৷৬২	„
Potato (tubers)	(আলু) ...	„	৩৷০২	„
(haulms)	(ঐ গাছ) ...	„	১৭৷০৭	„

যে চূণ কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয় তাহা পাথুরে চূণ। পাথর বা ঘুটিং পোড়াইয়া চূণ উৎপন্ন হয়। তাহাতে উত্তমরূপে জল ঢালিয়া দিতে হয়। জল ঢালিবামাত্র উহা হইতে উষ্ণ বাষ্প উদ্গত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ তাহা সূক্ষ্ম ধূলিবৎ হইয়া যায়। যতক্ষণ বাষ্প উদ্গত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহাতে অল্প অল্প জল সেচন করিলে যে বাষ্পটী বহির্গত হইয়া যায়, তাহাকে কার্ব্বণ-ডায়োক্সাইড (Carbon dioxide) কহে। অদগ্ধ অবস্থায় উক্ত পাথরকে বা ঘুটিংকে Limestone or Carbonate of lime কহে। দগ্ধীভূত হইবার কালে তদন্তর্গত কার্ব্বণিক-য়্যাসিড বা অঙ্গারিক-অম্ল চলিয়া গিয়া যে বিদগ্ধ প্রস্তর বা চূণ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে (quick lime বা Calcium oxide কহে।

কৃষিকার্য্যোপযোগী চূণ প্রস্তরজাত হইলেও স্থানবিশেষের প্রস্তরের তারতম্যে চূণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। ঘুটিং চূণ ও শ্রীহট্ট চূণ মধ্যে বিস্তর প্রভেদ দেখা যায় কিন্তু কৃষিকার্য্যের পক্ষে শ্রীহট্টের চূণই বিশেষ উপযোগী। এতজ্জাতীয় চূণের মূল্য

অধিক এবং অতিশয় তীব্র কিন্তু অল্প চূণে অধিক ও শীঘ্র কাজ হয় এবং তাহার ফল ও অনেক দিন থাকে।

চূণের প্রধান কার্য্য—ভূগর্ভস্থিত জৈব-পদার্থকে জীর্ণ করতঃ উদ্ভিদ-মূলের আহরণোপযোগী করিয়া দেওয়া। জমিতে চূণ প্রদত্ত হইলে প্রথমতঃ মাটিতে কোন কোন জৈব অম্ল (Organic acid) উৎপন্ন হয় এবং চূণ তাহার সহিত মিলিত হইয়া জৈব লবণে পরিণত হয়। এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ভূগর্ভস্থ জীবাণু-গণ (Microbes)* দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তাহাদিগের ক্রিয়া ফলে Calcium nitrate নামক চূণ-সম্পৃক্ত সোরাজানিক লবণে পরিণত হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবে চূণ উদ্ভিদের আহারের মধ্যে গণ্য হয় নতুবা টাট্‌কা অবস্থায় বিষবৎ জানিতে হইবে। উল্লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা চূণ কত পরিবর্ত্তিত হয়! আবার যে চূণ এত তীব্র ও দহনকারী তাহাই আবার উদ্ভিদখাদ্যে পরিণত হয়।

অতঃপর চূণের আরও বিশেষ গুণ এই যে, মৃত্তিকান্তর্গত পদার্থ মধ্যে যে সোডা বা পটাস্ আবদ্ধভাবে অবস্থিত, তৎসমুদয়কে বিমুক্ত করিয়া দেয়। এতদুভয় পদার্থই উদ্ভিদখাদ্য সুতরাং তাহা বিমুক্ত হইলে উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হয় তাহা বলাই বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত মৃত্তিকায় চূণ সংযোজিত হইলে নাইট্রেট-অব-পটাস বা সোরা উৎপন্ন হইবার সুযোগ ঘটে।

যাহা হউক, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে চূণ যে একটী বিশেষ উদ্ভিদ-

* মৎকৃত 'জীবাণু ও উদ্ভিদ' নামক পুস্তকে জীবাণু সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে। জীবাণু দ্বারা কৃষির কত উপকার হইতেছে তাহা উক্ত পুস্তক পাঠে বুঝা যায়।

খাদ্য সে বিষয়ে সংশয় নাই; সুতরাং চুণহীন ক্ষেত্রে কোন ফসলই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাহা ব্যতীত, উদ্ভিদের শিরা (tissues) রসাধার বা কোষ-প্রাচীর বা আবরণ (cell wall) গঠিত হইতে পারে না। এই জন্য ইতঃপূর্ব্বে আমরা ইহাকে কাঠাম-নির্ম্মাণক বা (Skeleton Builder) নামে অভিহিত করিয়াছি।

অতঃপর চূণ প্রয়োগে সকল প্রকার মৃত্তিকার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। বেলে জমিতে চূণ প্রয়োগ করিলে যেমন উহা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ও জলধারক হয়, আবার তেমনি এঁটেল মাটিতে দিলে মাটি আল্‌গা হয়, অধিক জলশোধক হয়।*

চূণ প্রয়োগ করিতে হইলে কর্ষণের গভীরতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেবল ভূপৃষ্ঠের মাপ লইয়া হিসাব হইতে পারে না। ভূমিকে যত গভীর করিয়া কর্ষণ করা যায় তাহার একটা আন্দাজ করিয়া তবে চূণের পরিমাণ ঠিক করিতে হইবে। দশ ইঞ্চ গভীর কর্ষিত ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় ৮/০ মণ চূণ দিতে পারা যায়। উক্ত চূণ প্রসারিত করিবার অব্যবহিতকাল পরেই বিদা দ্বারা উহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, ক্ষেত্রে প্রদান করিবার পূর্ব্বে নিয়মিতরূপে জলসিঞ্চন দ্বারা চূণকে স্নিগ্ধ করিয়া লইতে হইবে। কর্ষণ অগভীর হইলে উক্ত অনুপাতে চূণের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। পাঁচ ছয় বৎসর ব্যবধানে একবার চূণ দিতে পারা যায়। অতঃপর ক্ষেত্রস্বামীর বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতা নিয়োজিত করতঃ পরিমাণের বা প্রয়োগকালের ব্যবধানের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে হইবে। আমরা কেবল সঙ্কেত বলিয়া দিলাম। বিস্তৃত ক্ষেত্রে না দিয়া এক বা

* মৎকৃত "কৃষিক্ষেত্র" (পঞ্চম সংস্করণ) ১২৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

আও কাঠা ভূমিতে প্রয়োগ করিয়া প্রথমতঃ দেখা উচিত যে সে জমিতে কি পরিমাণ চূণ দেওয়া যাইতে পারে। স্বভাবতঃ উদ্ভিদ-ভস্ম মধ্যে যখন ৩০।৪০ ভাগও চূণ পাওয়া যায়, তখন তাহা উপেক্ষিত হইবার নহে, বরং উদ্ভিদের বিশেষ উপকারী বস্তু জানিতে হইবে। একে ত ইহা নিজেই অল্পাধিক উদ্ভিদখাদ্য, অতঃপর উহার সহযোগে মৃত্তিকান্তর্গত জৈব ও অজৈব পদার্থ সমধিক ও সহজে বিশ্লিষ্ট হইয়া উদ্ভিদাহারের উপযোগী হয়। মাটিতে ইহা না থাকিলে অনেক পদার্থ অনুৎ ফলতঃ অকর্ম্মণ্যাবস্থায় থাকে, তন্নিবন্ধন অনেক এবং অবশ্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য তাহাদিগের কোন ব্যবহারে আইসে না।

উদ্ভিদখাদ্যার্থে যে তিন জাতীয় পদার্থের একান্ত প্রয়োজন তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং চূণও যে উদ্ভিদগণ আহরণ করিয়া থাকে তাহাও আলোচিত হইয়াছে। তবে মাটিতে ইহার প্রাচুর্য্যবশতঃ ভূমিতে বড় একটা চূণের অভাব ঘটে না। এজন্য সচরাচর চূণের ব্যবহার নাই। কিন্তু ইহা যে কোন মতে উপেক্ষণীয় নহে, তদ্বিষয়েও সংশয় নাই। অতি মাত্রায় এবং শিকড় সন্নিহিত করিয়া কাঁচা বা তীব্র চূণ প্রয়োগ করিলে বিপরীত ফল অনিবার্য্য। এ সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

ইংরাজী ১৮৮৫ কি ৮৬ সালে, আমি যখন কাশিপুর কৃষি ও ঔদ্যানিক ইন্‌ষ্টীটিশনের সংস্রবে ছিলাম, তখন তথাকার তত্ত্বাবধায়ক জনৈক ইংরাজ (আমার ঔদ্যানিক শিক্ষাগুরু) কতকগুলি গাছে চূণ দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। যে সকল গাছে চূণ দেওয়া হয়, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সুন্দর সুঠাম যৌবনপূর্ণ আম্রবৃক্ষ ও পাতা-বাহার উদ্ভিদ পাটা-ঝাউ (Thuja orientalis)

উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বৃক্ষশ্রেণী (সংখ্যায় ২০।২৫টী) অপেক্ষাকৃত নাবাল জমিতে ও পুষ্করিণীর সন্নিকটে ছিল, আর আম্রবৃক্ষগুলি দূরে উচ্চ জমিতে ছিল। বিনা কারণে গাছে চূণ দিবার ব্যবস্থা হয়। বিনা কারণে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, গাছগুলির কোন দোষ ছিল না বরং বেশ সুশ্রী ও বর্দ্ধমান ছিল, তবে আরও তেজাল করিবার জন্য বোধ হয় চূণ দিবার ব্যবস্থা হয়। চূণ প্রয়োগ করায় বড় শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল। গুরু নিন্দা মহাপাপ। আমি গুরুনিন্দা করিতেছি না। ভ্রম-ভ্রান্তি কাহার না আছে? তবে চূণের অপব্যবহারে কি বিষময় ফল সংঘটিত হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে এ কথার উল্লেখ করিতেছি। ভ্রম-ভ্রান্তি ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা হয় না, কার্য্যে ব্যর্থমনোরথ হওয়া যত প্রয়োজন, সিদ্ধ মনোরথ হওয়া সে অনুপাতে নিতান্ত হীনমূল্য। বাঙ্গালায় একটী প্রবাদ আছে, "শতমারী বৈদ্য, সহস্রমারী চিকিৎসক" ইহার প্রকৃত অর্থই যে, যে যত অধিক বিফল হয়, সে ক্রমে তত সাবধানী ও বিচক্ষণ হয়। কোন পরীক্ষা ব্যর্থ হইলে আপাততঃ মনে কষ্ট হয় কিন্তু তাহা ক্ষণিক এবং ভবিষ্যতের উদ্দীপক। উল্লিখিত প্রবাদের একটী ইংরাজী ভাষ্য এই যে "Become sadder and wiser." যাহা হউক, প্রত্যেক ঝাউ গাছের গোড়ায় আধ ঝুড়ী এবং আম্র গাছে এক ঝুড়ী হিসাবে দেওয়া যায়। ইহার ৬।৭ দিবস পর হইতে ঝাউগাছগুলির হরিৎবর্ণ বিদূরিত হইয়া পাটকিলে (?) বা ব্রাউন রং দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া ১০।১২ মধ্যে তাবৎ গাছ শুকাইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঝাউগাছগুলি নাবাল যায়গায় ছিল, সুতরাং তথাকার মাটি নিতান্ত রসাল। এবম্বিধায় প্রদত্ত

চূণ অচিরে বিগলিত হইয়া কার্য্যকরী হইয়াছিল কিন্তু আম্রবৃক্ষগুলি উচ্চ ও উচ্চস্থানে থাকায় চূণ দ্বারা তখনও বিশেষ আঘাত পায় নাই। ঝাউগাছের কোন আশা নাই দেখিয়া তৎপ্রতি কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা না করিয়া আম্রবৃক্ষগুলির উপর দৃষ্টি করিতে হইল। সাহেবের তখনও ধারণা যে, চূণ দ্বারা গাছের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই সকল গাছ পুনরায় শীঘ্র নবপত্রে সুশোভিত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। ঝাউগাছগুলি মরিয়া গেল। আম্রবৃক্ষগুলিরও যাহাতে সেরূপ পরিণাম না হয়, তজ্জন্য আমরা সাহেবের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক বৃক্ষের পাদদেশে যতদূর চূণ প্রসারিত হইয়াছিল, ততদূর খৈলচূর্ণ ও গোময় একত্রে মিশ্রিত করিয়া মাটির সহিত কুদ্দাল সহযোগে মিশাইয়া দিয়াছিলাম এবং যাহাতে উক্ত মিশ্রসার শীঘ্র গলিত হইয়া চূণের তীব্রতার হ্রাস করে, সেজন্য প্রত্যেক বৃক্ষমূলে জলসেচন করা গেল। এক্ষণ হইতে উক্ত আম্রবৃক্ষগুলির বর্ণ বিনষ্ট হইবার গতি রুদ্ধ হইল এবং কয়েক দিবস পর হইতে পুনরায় স্বাভাবিক বর্ণের বিকাশ হইতে লাগিল। ইহা হইতে কয়েকটী বিষয়ে শিক্ষা পাওয়া যায়:—

(১) উদ্ভিদের বয়ঃক্রম ও বৃদ্ধি অনুসারে চূণের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা উচিত। অধিক ও তীব্র চূণে ভূগর্ভের জীবাণু মরিয়া যায়।

(২) বৃক্ষের পাদদেশে ঘনভাবে না দিয়া চারিপার্শ্বস্থ কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া চূণ দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে বৃক্ষমূলগণকে চূণের তীব্রতা স্পর্শ করিতে পারে না।

(৩) সদ্য বা টাট্‌কা চূণ না দিয়া, তাহার সহিত গোময় মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল হয়। যদিও তদ্দ্বারা গোময়স্থিত আপাতপ্রাপ্য যবক্ষারজান তিরোহিত হয়, তাহা হইলেও চূণের সংস্রব হেতু

অপরাপর পদার্থ শীঘ্র বিগলিত হয়, তন্নিবন্ধন উদ্ভিদগণ আশু উপকার লাভ করে। তাহা ব্যতীত, বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান আসিয়া মাটিতে সংযোজিত হয়।

(৪) কোন কৃষিফসলের ক্ষেত্রে চূণ দিতে হইলে, ফসলের সূত্রপাত করিবার অন্ততঃ দুইমাস পূর্ব্বে উহা প্রসারিত করণান্তর উত্তমরূপে ভূমিকে কর্ষণ করিয়া দিতে হয়।

এস্থলে একটী বিষয় জ্ঞাতব্য এই যে চূণের মধ্যে একটী উত্তাপ নিহিত থাকে। ঘুটিং, কাঁকর বা বাথার (শম্বুক) যাহাকেই দগ্ধ করা যাউক, প্রজ্জ্বলনকালে উহার অন্তর্গত উত্তাপ (Carbonic acid gas) বহির্গত হইয়া যায়। উক্ত বাষ্পই উত্তাপের কারণ। অতঃপর বায়ুসম্পৃক্ত হইলে তন্মধ্যে carbon dioxide জন্মে এবং জলসম্পৃক্ত হইলে উক্ত বাষ্প তাহা ত্যাগ করিয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। দগ্ধীভূত হইবার পর হইতে যতক্ষণ না জলসম্পৃক্ত হয়, ততক্ষণ সে চূণকে উষ্ণ চূণ (hot or unslaked lime) কহে। জলসম্পৃক্ত হইলে উহার তাবৎ উত্তাপ বহির্গত হইয়া যায়, তখন চূণের আর তীব্র ঝাঁজ থাকে না। ইহাকে শীতল বা শোধিত চূণ (slaked lime) বলে। জমির অবস্থা ও উদ্দেশ্য ভেদে কোথাও তপ্ত, কোথাও শোধিত বা শীতল চূণ ব্যবহার করিতে হয়।*

---

* চূণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ছাপা হইয়া যাইবার পরে মনে হয় যে, আমারই লিখিত চূণ সম্বন্ধে ধারাবাহিক কয়েকটী প্রবন্ধ হিতবাদী সংবাদপত্রের (সন ১৩০৭ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ, ৬ই পৌষ, ১৩ই পৌষ, ২০শে পৌষ, ২৭শে পৌষ তারিখে) প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধ কয়টী প্রয়োজনীয় বোধ করায় পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইল এবং তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়।

খাদ্যবিশেষের ফল।—পূর্ব্বাধ্যায়ে উদ্ভিদের চারিটী প্রধান জাতীয় খাদ্যের উল্লেখ করা গিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণ ও উপকারীতা আছে। তাহা ব্যতীত উহারা পরস্পরে এতই ঘনিষ্টরূপে সম্বদ্ধ যে, পৃথক পৃথক ব্যবহৃত হইলে তদ্দ্বারা পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না। চূণ, মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ বিদ্যমান, তাহা ব্যতীত উহার খরচ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং অপরাপর সামগ্রী মধ্যেও অল্পাধিক চূণ থাকে। এই সকল কারণে ক্ষেত্রে চূণের অভাব বড় একটা দেখা যায় না, সুতরাং একবার প্রদান করিলে ৫।৭।১০ বৎসর বা ততোধিককাল ক্ষেত্রে তাহার অভাব হয় না। অপর তিনটী খাদ্য সমূহ পরিমাণে ব্যয়িত হয় বলিয়া প্রতি বৎসর, অধিক কি, প্রতি ফসলের পরই পুনরায় উদ্ভিদকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা কৃষকের একটী নিয়মিত কর্ম্ম মধ্যে গণ্য। যখনই ক্ষেত্রে সার প্রদান করিতে হইবে, তখনই মনে করিতে হইবে যে, তাহা উদ্ভিদের খাদ্য। উক্ত খাদ্য অসম্পূর্ণ (incomplete) হইলে উদ্ভিদের সকল অভাব পূর্ণ হয় না।

অসম্পূর্ণ খাদ্য কি ?—যে সামগ্রী মধ্যে উদ্ভিদগণের উক্ত তিনটী বিশেষ ও প্রধান খাদ্যের অভাব থাকে, কিম্বা কোন দুইটী কিম্বা কোন একটী জিনিসেরও অভাব বা অল্পতা দৃষ্ট হয়, তাহাই অসম্পূর্ণ সার বা অসম্পূর্ণ খাদ্য জানিতে হইবে। উক্ত তিনটী সামগ্রীর সমবায় হইলে তবেই তাহাকে পূর্ণখাদ্য বা পূর্ণসার (perfect বা complete manure) নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। এতৎপ্রসঙ্গ ক্রমে সুবিখ্যাত জার্ম্মান কৃষিরাসায়নিক লাইবিগ

(Baron von Liebig) সাহেবের সুপ্রতিষ্ঠিত 'সামঞ্জস্য নীতি' (Law of Minimum) সূত্রের অনুসরণ করা উচিত।

সামঞ্জস্য নীতি কি?—কয়েকটী সামগ্রী একত্রিত করিলে যে জিনিসটী পূর্ণ হয়, দুইটি জিনিস দ্বারা তাহা পূর্ণ হয় না। তিনটী জিনিসের সমাবেশ ফলে যে এক মণ জিনিস উৎপন্ন হয়, দুইটী বা একটী জিনিসে একমণ হইলে ঠিক সে জিনিস জন্মে না। তাহাতে একটী জিনিস কম থাকিলে অপর দুইটীর পরিমাণ অধিক হইবে। আরও বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে একমণ সার দিতে হইবে, কিন্তু একমণ পূর্ণ-সার প্রস্তুত করিতে হইলে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফেট্‌ ও পটাস—এই তিনটী সামগ্রীর প্রয়োজন। এ স্থলে কোন একটী জিনিসের অভাবে অপর দুইটী জিনিসের প্রাধান্য হয়, ফলে তাহার কার্য্যকারীতা অন্যরূপ হয়। উক্ত সার মধ্যে নাইট্রোজেন না থাকিলে, ফস্‌ফেট ও পোটাস দ্বারা উদ্ভিদের সকল অভাব মিটিবে না এবং সেই অভাব হেতু উদ্ভিদ বৃদ্ধিশীল হইবে না। এতদ্ব্যতীত তিনটী সামগ্রীর সমাবেশ হইলেও প্রত্যেকের অনুপাতের তারতম্যে ফলের ইতরবিশেষ হয়। নাইট্রোজেনের ভাগ যথাযথ না থাকিলে গাছ বৃদ্ধিশীল না হইয়া নগণ্যাবস্থায় জীবিত থাকিবে এবং গাছের শোচনীয়তা হেতু অপরাপর সামগ্রীও যথাপরিমাণে আহরণ করিতে পারিবে না সুতরাং সমধিক বা পরিপুষ্ট ফসল হইবে না। সেইরূপ পট্যাস না থাকিলে কিম্বা অল্প থাকিলে অপর দুইটী পদার্থের আধিক্যহেতু ফলন হ্রাস পাইবে, কিন্তু গাছ বৃদ্ধিশীল হইবে। ইহাতে বুঝা যায়, সামঞ্জস্যতাকে বজায় রাখিবার জন্য উক্ত তিনটি পদার্থেরই প্রয়োজন, নতুবা অর্থ নষ্ট। তবে, ইহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, মাটিতে উক্ত

তিন সামগ্রীর কোন্ কোন্টীর পরিমাণ কিরূপ আছে, এবং তাহা বুঝিতে পারিলে কোন সামগ্রী কম, কোন সামগ্রী বেশী, পরিমাণে দিতে পারা যায়। আর একটী বিবেচনার বিষয় এই যে, যে ফসলের খাদ্যের জন্য ক্ষেত্রে সার দিতে হইবে, সে ফসল উক্ত তিনটীর মধ্যে কোন কোন সামগ্রী কত আহরণ করে, সেই অনুসারে কোন সামগ্রী অধিক, কোন সামগ্রী অল্প করিয়া দিলে অনেক অপব্যয় বাঁচিয়া যায়। যে ক্ষেত্র সমধিক নাট্রোজেনজনিত সারে পূর্ণ, তাহাতে উক্ত জাতীয় সার প্রদান করিলে কোন ফল হইবে না সুতরাং তাহা নষ্ট মধ্যে গণ্য। সেইরূপ সকল বিষয়ে জানিতে হইবে।

অনেক সার মধ্যে প্রায় উক্ত তিনটী পদার্থ বিদ্যমান কিন্তু পরিমাণের তারতম্যতা হেতু সকল ফসল আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ভারতবাসীগণ সচরাচর সেই সহজলভ্য গোশালার আবর্জ্জনা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, উহা দ্বারা ক্ষেত্রের কিছু অভাব বিদূরিত হয়, কিন্তু বিশেষ হয় না। যাহা হউক, উল্লিখিত কারণে গোময়ের বিশেষ প্রচলন আছে। গোশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি স্থানের মিশ্রিত আবর্জ্জনা মধ্যে উদ্ভিদ খাদ্যের প্রধান তিনটী খাদ্যই পাওয়া যায়, এজন্য ইহা পূর্ণ-সার মধ্যে পরিগণিত। সেই রূপ নানাবিধ খৈলও উক্ত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। কিন্তু তাহা হইলেও জাতিনির্ব্বিশেষে সকল খৈল বা সকল প্রাণীজ আবর্জ্জনা সমগুণসম্পন্ন নহে। এই জন্য খৈল-বিশেষের বা প্রাণী-বিশেষের সার মধ্যে উদ্ভিদখাদ্যোপকরণের ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন ফসল প্রাণীজ-সার দ্বারা, আবার কোন ফসল খৈল দ্বারা সমূহ উপকার পাইয়া থাকে। এই জন্য গোমায়ুর বা খৈলের সহিত

প্রয়োজন মত উল্লিখিত তিনটী প্রধান খাদ্যের সংযোগ ঘটিলে সার উদ্দীপক, এবং ফসল শস্যশালিনী হইয়া থাকে। সারের কার্য্য আছেই সুতরাং ক্ষেত্রে উল্লিখিত সারগুলির মধ্যে যে কোন সার প্রদান করা যাউক, তদ্দ্বারা কিছু উপকার হয়। মাত্র গোময় প্রদান করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, তাহার সহিত খৈল মিশ্রিত হইলে আরও ভাল ফসল পাওয়া যায়। আবার গোময় বা খৈলের সহিত অস্থি-চূর্ণ বা ফস্‌ফেট বা পটাস জাতীয় অপর সার সম্মিলিত হইলে প্রভূত উপকার দর্শিয়া থাকে। ফসলকে পূর্ণ মাত্রায় ফলবতী করিতে হইলে কয় জাতীয় সারই কৃষিক্ষেত্রে সর্ব্বদা মজুত রাখা কর্ত্তব্য উপরন্তু সেই সকল সার উদ্ভিদের আহার-োপযোগী অবস্থায় রাখিতে পারিলে আরও ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে উদ্ভিদের আশুপ্রয়োজনকালে সার প্রস্তুত করিবার জন্য অনর্থক অপেক্ষা করিতে হয় না। কোন্ সার কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ ফসলে কি কি পরিমাণে দিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যায় না, বরং নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ব্যবহারীর পক্ষে অনেক সময়ে ক্ষতির কারণ হইতে পারে, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। এ সকল বিষয়ে কৃষকের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা, কর্ষণের প্রকার, ঋতুর ব্যবহার, প্রত্যেক সারের গুণাগুণ, ফসলের বা উদ্ভিদের জীবন প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ই কৃষকের অবশ্য জ্ঞাতব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খৈল মধ্যে নাইট্রোজেন ব্যতীত কথঞ্চিৎ পরিমাণে পটাস ও ফস্‌ফরিক য়্যাসিড থাকে, কিন্তু প্রকৃত পট্যাস-সার (Muriate of potash) মধ্যে যত পট্যাস থাকে এবং সুপার-ফস্‌ফেট (Superphosphate) মধ্যে যত ফস্‌ফরিক-য়্যাসিড

থাকে, খৈল মধ্যে তত থাকে না, এই জন্য খৈলের সহিত উক্ত দুই জাতীয় সার অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত করা উচিত। অতঃপর, কোন খৈল মধ্যে শতকরা ২ ভাগ, আবার কোন খৈল মধ্যে শতকরা ৭।৮ ভাগও, নাইট্রোজেন থাকিতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে সকল খৈলের গুণ যে এক প্রকারের নহে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। প্রধানতঃ নাইট্রোজেন প্রদানের জন্যই খৈল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু একই খৈলের মধ্যে যখন উক্ত পদার্থের এত বৈষম্য, তখন খৈল যাচাই না করিয়া খরিদ করায় ক্ষতি আছে। সুতরাং খৈলের ওজনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তন্মধ্যে মণকরা কত সোরাজান আছে তাহা বিচার করিয়া প্রয়োজনমত খৈল খরিদ করিতে হয় এবং ক্ষেত্রেও সেই হিসাবে খৈল দিতে হয়। অতঃপর নাইট্রোজেন দিবার জন্য গোবিষ্ঠায়ুর ব্যবহার আছে কিন্তু উহার মধ্যে উক্ত পদার্থের তারতম্য আছে। পশুবিশেষে, বয়স-বিশেষে, ইহারা যে গোময় বা চোনা ত্যাগ করে তাহার বিভিন্নতা আছে। পশুর খাদ্য বিশেষেও গোময়ের তারতম্য হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে। গোবর ও খৈল মধ্যে তারতম্য বিলক্ষণ আছে সুতরাং একমণ গোময় ও একমণ খৈল সারত্ব হিসাবে এক হইতে পারে না তাহা ডাক্তার ভয়েলকার সাহেব রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।*

গোময় মধ্যে শতকরা	...	১-৩৪ ভাগ	}	নাইট্রোজেন
গোময় ভস্মে „	...	·১৭ „	}	
রেড়ী খৈল „	...	৪-৯৪ „	}	

* Improvement of Indian Agriculture by Dr. J. A. Voelker, Ph, D., B. A., &c, Page. 414.

ডাক্তার ভয়েকার ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ইং ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসিয়া বৎসরাধিককাল থাকিয়া ভারতের কৃষিবিষয়ে নানাবিধ অনুসন্ধান করেন। তৎ-সমুদায় তাঁহার পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। সেই পুস্তকের পরিশিষ্ট মধ্যে নানাবিধ সার প্রভৃতির বিশ্লেষণ-ফল লিখিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অতঃপর ডাক্তার স্কুলটন সাহেব কৃত কয়েকটী বিশ্লেষণ-ফল উদ্ধৃত করিলাম। সোরা মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নাইট্রোজেন থাকে বলিয়া সোরার উপকারীতার মূল্য ১০০ ধার্য্য করিয়া অপরাপর জিনিসের আনুপাতিক তুলনা করিয়াছেন।*

জিনিসের নাম			(নাইট্রোজেন) প্রকৃত পরিমাণ(শতকরা)	
Saltpetre (সোরা)	[illegible]০	,,	১৫-৫	ভাগ
Sulphate of ammonia (সলফেট্-য়্যামোনিয়া)	৯০-৯৫	,,	২০-৫	,,
Peru guano (গুয়ানো)	৮৫	,,	১৭-২০	,,
Blood meal (শুষ্ক শোণিত)	৮০	,,	১৩-৫	,,
Steamed horn meal (বাষ্পিত শৃঙ্গ চূর্ণ)	৭০	,,	১৫	,,
Fish manure (মাছের সার)	৬০	,,	৮-৫	,,
Castor cake (এরণ্ড খৈল)	৬০	,,	৪-০	,,
Animal meal (গোবরাদি)	৬০	,,	৮-০	,,

* Soil Cultivation by Dr. B. Schulten, Ph. D., F. C. S. &c.

Pondrette (নরপুরীষ)	৫৫	,,	৭-০	,,
Raw bone meal (অসিদ্ধ বা কাঁচা অস্থিচূর্ণ)	৫৫	,,	৪-০	,,
Wool dust (পশমের ধূলা)	২৫	,,	৪-০	,,
Leather meal (চামড়ার ধূলা)	১০	,,	৭-০	,,

উপরোক্ত তালিকা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কৃষিকার্য্যে নাইট্রোজেনের জন্য সাররূপে যে সকল জিনিস সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যে সম্ভবতঃ কি পরিমাণ নাট্রোজেন থাকে। বলা বাহুল্য যে, নানা কারণে উক্ত ভাগসমূহ মধ্যে অল্পাধিক ভেদ হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাহাহইলেও প্রত্যেক জিনিষের আনুপাতিক হিসাব বুঝা যায়। উল্লিখিত তালিকানুসারে সাধারণতঃ যে সকল জিনিসকে অতি মূল্যবান মনে করিয়া লোকে ব্যবহার করে তাহাদিগের স্থান নাইট্রোজেন হিসাবে যে অনেক নিম্নে তাহা পুরিষ, খৈল, কাঁচা অস্থি-চূর্ণাদির অঙ্ক দেখিলেই বুঝা যাইবে।

উপরে যে নাইট্রোজেনপ্রধান কয়েক প্রকার সামগ্রীর উল্লেখ করা গেল তৎসমুদায় কাঁচা মাল (Raw materials) মধ্যে গণ্য। এ সকল পদার্থের বহুপরিমাণ ব্যবহার না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তাহা ব্যতীত, স্থানান্তর হইতে আনাইতে বহনী খরচা—রেল, ষ্টিমার, নৌকা, মুটে প্রভৃতির ভাড়া—অপেক্ষাকৃত বহু অধিক পড়িয়া যায়। যাহাদিগের ২।৫ সের খরচ তাঁহারা উক্ত খরচে অধিক মনে না করিতে পারেন কিন্তু যাঁহারা ২০।৫০ মণ হইতে দুই-দশ হাজার মণ খরিদ করেন তাঁহাদিগের পক্ষে সে খরচা

বড় কম নহে। কিন্তু সে সকল অসুবিধা দিন দিন দূর হইতেছে; দিন দিন নূতন নূতন উদ্ভিদখাদ্য ঘনীভূত আকারে প্রস্তুত হইতেছে সুতরাং সকল দিকে বিশেষ সুবিধার দিন আসিতেছে।

নাইট্রোজেন-প্রধান কয়েকটী কৃত্রিম সারের নাম ও বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) নাইট্রেট-অব-সোডা (Nitrate of Soda)।— ইহা লবণ সদৃশ পদার্থ। ইহাতে ১৫-৫ ভাগ নাইট্রোজেন (১৯ ভাগ য়্যামোনিয়া) থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম-কূল-সংলগ্ন বৃষ্টিহীন প্রদেশে ইহার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইহাতে প্রায় শতকরা ১৫৷৷০ সাড়ে-পনর ভাগ আশু ব্যবহারোপযোগী নাইট্রোজেন বিদ্যমান, সুতরাং তাবৎ নাইট্রোজেনজনিত সার অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী এবং শীঘ্র উদ্ভিদগণের ব্যবহারে আইসে।

(২) সল্‌ফেট্‌-অব-য়্যামোনিয়া (Sulphate of ammonia)।—কাঁচা পাথুরে-কয়লা (Coal) হইতে গ্যাস বাহির করিয়া লইলে উহা উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে ইহার বড় ব্যবহার না থাকায় নষ্ট হইত কিন্তু বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া আজ কাল ইহার খুব চলন হইয়াছে। ইহার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন (২৪ ভাগ য়্যামোনিয়া) থাকে। নাইট্রেট-অব-সোডা অপেক্ষা ইহা ধীরভাবে কার্য্য করে। রসা দেশে বা ভিজা মাটিতে নাইট্রেট-অব-সোডা অপেক্ষা অধিক উপকারী, কারণ ইহা তত দ্রবনীয় নহে এবং সেই জন্য ধীরে ধীরে উহার কার্য্য হয়। প্রতি হন্দরের (cwt) মূল্য ১৩৲ টাকা।

(৩) নাইট্রোলিম্ (Nitrolim)।—বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিজলী সহযোগে বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেনকে চূণ ও কার্ব্বণ

মধ্যে অবরুদ্ধ করিলে নাইট্রোলিম্ উৎপন্ন হয়। চূণ ও কার্ব্বণ মধ্যে উল্লিখিত উপায়ে নাইট্রোজেন অবরুদ্ধ হইলে তাহাকে নাইট্রোলিম্ বা সিয়ানেমাইড-অব-লাইম (Cyanamide of lime) কহে। এতদিন একটী সমস্যা ছিল যে, বায়ুমণ্ডল মধ্যে অপর্য্যাপ্ত নাইট্রোজেন থাকিতে কৃষিকার্য্যের জন্য কত প্রকার বহুমূল্য সার ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু নাইট্রোলিমের সৃষ্টি হওয়ায় সে সমস্যা দূর হইয়াছে, তৎসঙ্গে মূল্য সস্তা। এতদ্ব্যতীত নাইট্রোলিমের আরও বিশেষত্ব এই যে, এতন্মধ্যে প্রায় ৬২-৫ ভাগ চূণ থাকে, সুতরাং ক্ষেত্রে নাইট্রোলিম প্রয়োগে নাইট্রোজেন ও চূণ—উভয়ই দেওয়া হয়। ইহাতে ১৮ ভাগ নাইট্রোজেন অর্থাৎ ২২ ভাগ য়্যামোনিয়া প্রাপ্তব্য। ইহার মূল্য প্রতি হন্দর (cwt) ১১৲ টাকা।

(৪) নাইট্রেট-অব-লাইম (Nitrate of lime)।—নাইট্রোলিমের ন্যায় ইহাও নাইট্রোজেন সম্বলিত চূণ এবং উল্লিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ১৩ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। নাইট্রেট্-অব-সোডা সদৃশ ইহার গুণ।

এতদ্ব্যতীত সচরাচর যে কয়েকটী জান্তব পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করিলে কাঁচা (raw) সার অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। নিম্নে তাহাদের বিবরণ দিলাম :—

শুষ্ক-শোণিত।—কশাইখানা হইতে শোণিত সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করণান্তর চূর্ণ করিলে উহা প্রস্তুত হইল। প্রাণী বিশেষের শোণিত মধ্যে তারতম্য আছে, তাহা হইলেও স্থূলতঃ হিসাবে উহাতে ১০ হইতে ১৪ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত ইহাতে অল্পাধিক ফস্ফরিক য়্যাসিড্ও থাকে।

মৎস্য-সার।—মৎস্যকে শুকাইলে বা পচাইলে এই সার

জন্যে। মৎস্যের অগলনীয় পদার্থ—কণ্টক ও আঁসকে চূর্ণ না করিলে শীঘ্র গলে না। এজন্য উহাদিগকে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিতে হয়। ইহার মধ্যে একটী জ্ঞাতব্য কথা এই যে, মৎস্য মধ্যে তৈল থাকে। তদন্তর্গত তৈলকে বহিষ্কৃত না করিলে অচিরে বিগলিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। অল্পাধিক উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ করিলে তাবৎ তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে, তখন সেই তৈলকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হইবে। মৎস্য-সারে ৯।১০ ভাগ নাট্রোজেন থাকে, তবে মৎস্য বিশেষে তাহার ইতরবিশেষ হয়। মাছের কণ্টকাদিতেও বিশেষ পরিমাণে ফস্ফরিক পদার্থ বিদ্যমান।

কশাইখানা-সার।—শোণিত ব্যতীত কশাইখানায় পিত্ত. অস্থি, প্রভৃতি অনেক পাওয়া যায়। তৎসমুদয়কে সংগ্রহ করতঃ তৈল নিষ্ক্রান্ত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পচাইয়া বা গুড়াইয়া সাররূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। উক্ত সার মধ্যে শতকরা ন্যূনাধিক ১২ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৮ ভাগ ফস্ফরিকাম্ল থাকে, এজন্য ইহা একটী বিশেষ ও মূল্যবান সার মধ্যে পরিগণিত।

ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গবাদি পশুশালার আবর্জ্জনা কিম্বা খৈল মধ্যে যে যে উদ্ভিদখাদ্য যে যে পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়, জান্তব সারে তাহা অপেক্ষা অনেক সার-পদার্থ সমাবিষ্ট থাকে। শতকরা ৪ ভাগ নাইট্রোজেনবিশিষ্ট তিন মণ খৈলে যত নাইট্রোজেন পাওয়া যায়, একমণ কশাইখানার পরিত্যক্ত জিনিস হইতে তাহা পাওয়া যায় অথচ এ সকল সামগ্রীর এদেশে বড় ব্যবহার নাই সুতরাং মূল্যও যৎসামান্য।

উল্লিখিত যে কয় প্রকার জিনিসের নামোল্লেখ করা গেল তৎসমুদায়

ব্যতীত উদ্ভিজ্জ সামগ্রী মধ্যেও সেই সকল উদ্ভিদখাদ্য বিদ্যমান। যে সকল সামগ্রী উদ্ভিদের খাদ্য মধ্যে পরিগণিত, তৎসমুদয় পদার্থ উদ্ভিদগণ আহরণ করিয়া স্ব স্ব অবয়ব মধ্যে রাখিয়া দেয় কিন্তু যে সকল সামগ্রী তদবস্থায় না থাকিয়া রূপান্তরিত হইয়া অপরাপর সামগ্রী—যথা শ্বেতসার, পত্রহরিৎ, শর্করা, লাক্ষা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। এ সকল জিনিস যে মূল পদার্থ হইতে [illegible] ও বিশ্লেষিত তাহা নিশ্চয় এবং আপাততঃ সংযুক্তাবস্থায় থাকিলেও পুনরায় সহজেই অণুপরমাণুতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অনন্তর ইহা আমরা জানি যে, অল্পদিন হইল ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, জীবিত শিম্বীক-উদ্ভিদগণ বায়ুমণ্ডল হইতে সমূহ পরিমাণে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, কারণ যে ভূমিতে তাহাদিগের আবাদ হয়, তাহাতে তাহারা অর্জ্জিত নাইট্রোজেনকে সমূহ পরিমাণে শোধন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের অবয়বেও অপেক্ষাকৃত অধিক নাইট্রোজেন থাকে। এইজন্য আজ কাল অনেকেই নাইট্রোজেন-ধারক উদ্ভিদ—শণ, মাঠকলাই, নীল, ধঞ্চে প্রভৃতির আবাদ করিয়া সেই সমগ্র ফসলকে অপরিণত অবস্থাতেই ভূশায়ী করিয়া দেয়। এতদ্দ্বারা ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন প্রদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ত হয়ই, তাহা ব্যতীত, উদ্ভিজ্জ পদার্থের আধিক্য হেতু মৃত্তিকার প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বালুকাপ্রধান মাটির রস-ধারণাক্ষমতা, রস-পরিশোষণা-ক্ষমতা প্রভৃতি তিরোহিত হয়; চিক্কণ বা আটাল মাটির স্থিতি-স্থাপকতা, এবং বায়ুমণ্ডলের বাষ্পীয় পদার্থ আহরণের শক্তি, বৃদ্ধি পায় এবং ভূগর্ভস্থ খাদ্য ও রস সৌরাকর্ষণ প্রভাবে তলাচি (Surface) অভিমুখে, সহজে ও অধিক পরিমাণে, উঠিবার পথ সরল হয়।*

* মৎকৃত 'মৃত্তিকাতত্ত্ব' দেখুন।

ফস্ফরিক-অম্ল।—ক্ষেত্রে ফক্ষরিক-য়্যাসিড সংযোজিত করিবার জন্ত যে যে পদার্থের প্রয়োজন অথবা যে সকল সামগ্রী প্রদত্ত হইলে ক্ষেত্রে ফক্ষরিক-য়্যাসিড প্রদানের ফল পাওয়া যায় একণে তাহা দেখা যাউক।

সুপারফস্ফেট (Superphosphate of Lime) সংক্ষেপে ইহা সুপার নামে অভিহিত। সুপার দুই জাতীয়—১ম ধাতব, ২য় প্রাণীজ।

(১) **খনিজ সুপার (Mineral super)।**—খনিজ-ফক্ষেট চূর্ণ করতঃ তীব্র দ্রাবজল (Sulphuric acid) দ্বারা শোধন করিলে ধাতব সুপার উৎপন্ন হয়। জিপ্সম্ (Gypsum), এপেটাইট্ (Apatite) প্রভৃতি খনিজ পদার্থ হইতে যথেষ্ট ফক্ষেট পাওয়া যায়। উহারা প্রস্তর সদৃশ বা বহু প্রাচীনকালের জীব জন্তুর মৃত কঙ্কাল জমাট বাঁধিয়া ভূগর্ভেই থাকে। যাহাহউক, উল্লিখিত প্রক্রিয়ানুসারে খনিজ পদার্থকে শোধন করিলে তদন্তর্গত চূণাংশ তিরোহিত হয় এবং তাহার স্থানে জল আশ্রয় গ্রহণ করে।

একণে তদন্তর্গত ফক্ষেট্ সহজেই জলের সংশ্রবে আসিলে বিগলিত হইয়া জলে মিশাইয়া যায়। উক্ত প্রক্রিয়ার অধীন হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত না হইলে সদ্য বা কাঁচা ফক্ষেট জলের সহিত মিশিতে পারে না, ফলতঃ তদ্দ্বারা উদ্ভিদের কোন উপকার হয় না। মৌলিক ফক্ষেটের তারতম্যে সুপার মধ্যে শতকরা ১৩ হইতে ১৮ ভাগ ফক্ষরিক-য়্যাসিড পাওয়া যায়।

প্রাণীজ-সুপার।—উক্ত সার অর্থাৎ প্রাণীজ-সুপার অস্থিচূর্ণ বা অস্থিভস্মকে গন্ধক-দ্রাবক বা দ্রাবজল (Sulphuric acid) দ্বারা যথানিয়মে শোধন করিলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তজ্জনিত সুপার

অপেক্ষা অস্থিচূর্ণজাত সুপার অধিক সারাল। শেষোক্ত সুপার মধ্যে কতক পরিমাণে অর্থাৎ ৪।৫ ভাগ ফস্ফরিক-অম্ল থাকিতে পারে কিন্তু ভস্মে পরিণত হইবার কালে অস্থিগত-নাইট্রোজেন বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং তাহাকে নাইট্রোজেন-বিবর্জ্জিত 'সুপার' বলিতে হইবে।

যাহা হউক, অস্থিচূর্ণ (Bone-meal) ও অস্থিভস্ম, সুপারের ন্যায় তাদৃশ আশুফলপ্রদ নহে, কারণ অস্থিচূর্ণের ফস্ফরিক য়্যাসিড্ অপরাপর পদার্থমধ্যে আবদ্ধভাবে (combined) অবস্থান করে। এতদবস্থায় ভূমিতে প্রদত্ত হইলে বিগলিত হইয়া ফস্‌ফরিক-য়্যাসিড্ বিমুক্তি লাভ করিতে, দানাসমূহের আকারানুসারে, ২।৩ মাস সময় লাগিয়া থাকে, সুতরাং বর্ত্তমান ফসলের তত উপকারে আইসে না। দ্রাবক সংযুক্ত না হইলে আবদ্ধ ফস্ফরিক-য়্যাসিড পৃথক হইতে চাহে না। এই জন্য কৃত্রিম উপায়ে দ্রাবক-জল দ্বারা শোধিত করিয়া লইতে হয়। মাটির সংস্পর্শে থাকিয়া ফস্ফরিক-য়্যাসিড্ যে পৃথক্ হয়, তাহার কারণ এই যে, সকল জমিতেই অল্লাধিক গন্ধকদ্রাবক বা অপর দ্রাবক আছে, ফলতঃ তাহাদিগের বলে অস্থির চূর্ণ বা ভস্মমধ্যস্থ ফস্ফরিক-য়্যাসিড্ ক্রমশঃ পৃথক্ হয় এবং এই জন্য অশোধিত সার প্রদানে তত শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না।

অস্থিচূর্ণ, সূক্ষ্মতানুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের আহরণোপযোগী হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সূক্ষ্ম বা স্থূল চূর্ণ প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বড় বড় ধান্যের আকার হইতে সূক্ষ্ম ধূলিকণাবৎ আকারের অস্থিচূর্ণ প্রস্তুত হয়। অল্পকালস্থায়ী ফসল ধান্য, গোধূম, আলু প্রভৃতির

জন্ত ধূলিবৎ চূর্ণ ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু স্থূল চূর্ণ ব্যবহৃত হইলে উহা বিগলিত হইয়া উদ্ভিদখাদ্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, হয় ত ফসল সংগৃহীত হইবার সময় আসিয়া পড়ে, ফলতঃ সে ফসল উহা হইতে কোন উপকার পায় না, তবে তদ্দ্বারা পরবর্ত্তী ফসলের উপকার হয়। বিগত ইং ১৮৯২।৯৩ সালে মুর্শিদাবাদে আলু ক্ষেত্রে অস্থিচূর্ণ প্রদান করা যায়। উক্ত চূর্ণের দানাসমূহ চিঁড়া বা মুড়ির ন্যায় ছিল। আলু রোপণের ২।৪ দিবস পূর্ব্বে তাবী-গাছের চিহ্নিত স্থানে স্থানে অস্থিচূর্ণ দেওয়া যায়। সারের পরীক্ষা হেতু ভিন্ন ভিন্ন চৌকায় স্বতন্ত্রভাবে সার দেওয়া হইয়াছিল। ফসল-সংগ্রহকালে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দেখা গেল যে, অস্থিদানা-সমূহের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, ফসলেরও কোন বিশেষত্ব দেখা যায় নাই। কিন্তু, যে যে ক্ষেত্রে অস্থি চূর্ণের সহিত খৈল বা গোময় দেওয়া গিয়াছিল, তাহাতে অপেক্ষাকৃত ফলন অধিক হইয়াছিল, আলুও বড় বড় হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, মাত্র অস্থিচূর্ণ শীঘ্র বিগলিত হয় না, উহার সহিত উদ্ভিজ্জপদার্থ মিশ্রিত হইলে শেষোক্ত পদার্থান্তর্গত দ্রাবক বা অম্ল দ্বারা বিগলন ক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি হয়। অম্ল একটী বিশেষ জারক, এজন্য চূর্ণ করিবার পূর্ব্বে অস্থিসমূহকে যে কোন অম্লরসপ্রধান ফল—আমড়া, তিন্তিড়ী, লেবু প্রভৃতির সংস্পর্শিত করিয়া রাখিলে অস্থিসমূহ কোমল ও জীর্ণ হয়, সুতরাং তাহাকে সহজে গুঁড়া করিতে পারা যায়। তাহা ব্যতীত, অস্থিমধ্যস্থিত ফস্ফরিক-য়্যাসিডও অল্পাধিক পৃথক্ হইয়া পড়ে।

মোটাদানা অস্থিচূর্ণ কালবিলম্বে বিগলিত হয় এবং তাহার উপকারীতা উদ্ভিদে প্রকাশ পাইতে সময় লাগে সুতরাং স্থায়ী

ফলকর বৃক্ষের জন্য, মুকুলিত হইবার ২।৪ মাস পূর্ব্বে ক্ষেত্রে তাহা প্রদান করা উচিত। আম্র, কাঠাল, লিচু প্রভৃতি বৃক্ষে পৌষ-মাঘ মাসে মুকুল দেখা দেয়, অতএব এ মুকুল গাছের জন্য মোটা অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং এতদর্থে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে উক্ত সার মাটিতে সম্মিলিত করিয়া দিলে পৌষ মাঘ মাসে তাহা উদ্ভিদের ব্যবহারে আসিবে, সুতরাং তদ্দ্বারা ফসলের সমূহ উপকার হইবে। আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ভূমি বেশ সরস থাকে, তন্নিবন্ধন দানাসমূহ অচিরে কোমল হইয়া জীর্ণ হইতে থাকে। উত্তাপের দিনে ভূমির রসালতা হ্রাস পাইয়া থাকে, এজন্য সে সময়ের প্রদত্ত অস্থিচূর্ণ বিগলিত হইতে বিলম্ব হয়। বর্ষা আসিয়া পড়িলেই বিগলন ক্রিয়ার তৎপরতা বৃদ্ধি হয়। বর্ষা-কালের বা শীত ঋতুর ফসলগণ তদ্দ্বারা উপকার পাইয়া থাকে।

নিয়মিতভাবে অস্থি-সার ব্যবহার করিতে হইলে ক্ষেত্র মধ্যে প্রয়োজনমত ছোট বা বড় ২।৪টী পাকা হৌজ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সারকে জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে সকল সময়েই তাহা আশু কাজে নিয়োজিত হইতে পারে। আরও এক কথা এই যে, অস্থিচূর্ণ সূক্ষ্ম-দানা হইলেই ভাল হয়। হৌজমধ্যে অস্থিচূর্ণকে জলমগ্নাবস্থায় রাখিতে হয় এবং তাহাতে অল্পাধিক গোময়, খৈল বা উদ্ভিজ্জ—পাতা-লতাদি বা তজ্জাত ভস্ম মিশাইয়া দিলে শীঘ্র বিগলিত হয় এবং সারের উপকারীতা বৃদ্ধি পায়। মাত্র একটী সামগ্রীতে আংশিক সার হয় কিন্তু অপরাপর জিনিস মিশ্রিত হইলে অল্পাধিক পূর্ণসার (Complete manure) উৎপন্ন হয়।

হৌজ মধ্যে সংরক্ষিতভাবে অস্থিচূর্ণ বা অন্য কোন সারকে রাখিলে অল্পদিন মধ্যে তাহাতে অনেক কীট জন্মে, বহির্দ্দেশ

হইতে রাশি রাশি কীট পতঙ্গ এমন কি, ইন্দুর, গন্ধমূষিক, ভেকও তন্মধ্যে পতিত হয় এবং তাহাতেই পচে, তন্নিবন্ধন সারের গুণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়—সারের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

অস্থিচূর্ণ মধ্যে প্রায় ২২ ভাগ, এবং দ্রাবকশোধিত চূর্ণ মধ্যে ১৩।১৪ ভাগ ফস্ফরিক-অম্ল থাকে। প্রথমোক্ত অস্থিচূর্ণ হইতে শেষোক্ত অস্থিচূর্ণে ৮।৯ ভাগ কম ফস্‌ফরিক অম্ল থাকিলেও শেষোক্ত চূর্ণ সমধিক ও শীঘ্র কার্য্যকরী সার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কারখানার ঝামা।—লৌহের কারখানায় ইস্পাত (Steel, pig iron) নির্ম্মাণার্থ যে সকল মসলা ও কয়লা নিয়োজিত হয়, তাহারই ঝামা বা ভূতড়ীকে স্ল্যাগ (Slag) কহে। উহা গুঁড়া করিলে সারের কার্য্য হয়। ইহাতে ১৬ হইতে ১৮ ভাগ ফস্‌ফরিক-য়্যাসিড থাকে, তাহা ব্যতীত ২০ ভাগ চূণ থাকায় উক্ত সামগ্রীর সারবত্তা সমবিধ মূল্যবান ও কার্য্যকরী। উহা সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরমাণুতে পরিণত না হইলে কার্য্যোপযোগী হয় না।

গুয়ানো।—আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা স্থানে রাশি রাশি গুয়ানো বহুকাল হইতে সঞ্চিত হইয়া পর্ব্বতাকারে পড়িয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহার ব্যবহার ছিল না কিন্তু ইদানীং ইহার যথেষ্ট চাহিদা হওয়ায় নানা স্থানে গুয়ানো রপ্তানি হইতেছে কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ বিশুদ্ধ বা খাঁটি গুয়ানো পাওয়া যাইত, এক্ষণে চাহিদার আধিক্য হেতু জিনিসে যথেষ্ট ভেল বা ভেজাল চলিয়াছে। পূর্ব্বে, মাত্র পেরুদেশেই ইহা পাওয়া যাইত। তাহা ব্যতীত, এক্ষণে নানা পক্ষীর বিষ্ঠা গুয়ানো নামে চলিত। গুয়ানো, পক্ষী বিশেষের বিষ্ঠা। ইহার মধ্যে ফস্‌ফরিক-সার ৫।৬ হইতে ৩০।৩৫ ভাগ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, ইহাতে ৪।৫ হইতে ১০।১২ ভাগ

নাইট্রোজেন থাকে। উক্ত সার সহজেই গলনীয় এবং ফস্‌ফরিক ও নাইট্রোজেন পদার্থ একত্রে থাকায় বড়ই মূল্যবান সার মধ্যে পরিগণিত। গুয়ানো ব্যবহারে আশুফল পাওয়া যায়।

প্রকৃত গুয়ানো দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরু দেশে উৎপন্ন হয়। অনেকের ধারণা যে গুয়ানো নামক কোন পক্ষী আছে; কিন্তু তাহা ভ্রম। পেরুদেশে বিষ্ঠাকে হুয়ানো (Huano) কহে এবং উক্ত শব্দ তথাকার সামুদ্রিক পক্ষীর বিষ্ঠাজ্ঞাপক, সুতরাং 'হুয়ানো' দ্বারা উক্ত পক্ষীর বিষ্ঠা বুঝিতে হইবে। এক্ষণে সেই হুয়ানো শব্দ হইতে 'গুয়ানো' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

দেশী গুয়ানো।—পারাবত, চামচিকা, কুক্কুট প্রভৃতির বিষ্ঠা এ দেশে বিরল নহে কিন্তু এ সকল আমরা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখি নাই, খরিদ করিতেও পাওয়া যায় না। যাঁহারা পারাবত বা কুক্কুট পোষেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া কৃষিকার্য্যার্থে ব্যবহার করিতে পারেন। উল্লিখিত কয় প্রকার গুয়ানোই বিশেষ তেজস্কর।

পট্যাসিক সার।—ক্ষেত্রে পট্যাস সংযোজিত করিবার জন্য প্রধানতঃ কাইনিট, মিউরিয়েট-অব-পটাস্ সল্‌ফেট্-অব-পটাস্ ও উদ্ভিজ্জ ভস্ম ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ ভস্মকে স্বভাবজাত পটাস্ ও অপর দুইটীকে কৃত্রিম বা শোধিত পটাস বলা যায়। শোধিত পটাস্‌দ্বয়ে প্রায় ৫০ ভাগ পটাস থাকে, কিন্তু উদ্ভিজ্জ ভস্মে পটাসের পরিমাণের কোন নিশ্চয়তা নাই কারণ উদ্ভিদ বিশেষের মধ্যে পটাসের পরিমাণের ইতরবিশেষ আছে। অপর দুই পটাস্ জর্ম্মানির পটাস্-খনিজাত অবিশুদ্ধ ময়লা লবণ-সদৃশ পদার্থ মাত্র। যে প্রণালীতে খনিজ লবণ বা সোরাকে

সংস্কৃত বা পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়, খনিজাত পটাস্‌কে তদনুরূপ উপায়ে পরিশুদ্ধ করিয়া লইলে মিউরিয়েট ও সল্‌ফেট্‌-অব-পটাস্‌ উৎপন্ন হয়।

বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের স্বতন্ত্র খাদ্য আছে। অনেক উদ্ভিদ নাইট্রোজেন, অনেক উদ্ভিদ ফস্‌ফরিক-য়্যাসিড, আবার অনেক উদ্ভিদ্‌ পটাস্‌ সমধিক পরিমাণে পাইবার প্রত্যাশা করে। নির্ব্বিশেষ-ভাবে সার প্রস্তুত করিলে সকল উদ্ভিদের সকল অভাব পূরণ হয় না। পানের বরোজে খৈল-সার ব্যবহৃত হয়। নাইট্রোজেন প্রধান বলিয়া তদ্দ্বারা পানের পত্র সংখ্যা অধিক হয়, পত্রের আকার বড় হয়, পত্র ভঙ্গুর অর্থাৎ মচ্‌মচে হয়। কিন্তু পানের খাদ্যে অধিক পটাস থাকিলে পত্রসমূহের কোমলতা সমন্বিত ভঙ্গুরতা থাকে না, পত্রের শিরাসমূহ স্থূল হয়, সুতরাং পানের আস্বাদ ঝাল হয়, শাঁস ছিব্‌ড়াপূর্ণ হয়। ঈদৃশ পানের বড় আদর হয় না। ফস্‌ফরিক-য়্যাসিড বা চূণ অধিক হইলেও পানের সেই সকল দোষ ঘটে। এই সকল খাদ্যের সহিত নাইট্রোজেন অধিক থাকিলে পত্রের সংখ্যা অধিক বা আকার বড় হইতে পারে, কিন্তু পানের ত তাহা প্রকৃত গুণ নহে। নানাবিধ শাকপাতা বা ফল পাকুড় আমরা ব্যবহার করি, উহাদিগের বৃদ্ধি যত ত্বরিত হইবে, তত কোমল ও মধুর হইবে। নাইট্রোজেন-প্রধান উদ্ভিদখাদ্য দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অবাড়ন্ত গাছ অধিক পরিমাণে ফস্‌ফরিক-য়্যাসিড ও পটাস্‌ গ্রহণ করিয়া বিকৃত হয়, বিস্বাদ হয় সুতরাং তাহা রুচিকর হয় না। তামাকের ফসলে অপেক্ষাকৃত অধিক পটাসের প্রয়োজন সুতরাং তাহাতে ইহার ভাগ যথাযথ না থাকিলে ভাল তামাক উৎপন্ন হয় না। চুরুটের ছাই যত

ত্তর হয়, তত তাহা ভাল তামাক নামে আখ্যাত হয় কিন্তু পটাসহীন বা অল্প-পটাস-ক্ষেত্রজাত তামাকের ছাই অল্লাধিক মলিন হয় এবং তাহার স্বাদ বা সৌরভ প্রীতিকর হয় না।

উদ্ভিজ্জ ভস্ম।—ইহার মধ্যে প্রকৃত পটাসের ভাগ কত থাকে তাহার নিশ্চয়তা নাই এবং তাহার কারণ কি—তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। ভেলশূন্য অর্থাৎ আসল উদ্ভিদ-ভস্ম হইলে তাহাতে ৯ ভাগ পর্য্যন্ত পট্যাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বড় বিরল। যাহা পাওয়া যায় তাহাতে ৩।৪ ভাগ মাত্র পট্যাস থাকে। এই জন্য উদ্ভিজ্জ পট্যাসের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে খনিজ পট্যাসের সমধিক প্রাদুর্ভাব। তাহা ব্যতীত, ইহা সহজে লভ্য ও বহনীয়, এবং সত্ত্ব ফলোৎপাদক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর সকল দেশেই জার্ম্মনির পট্যাস চলিতেছে, জর্ম্মনির খনি হইতে প্রতিবৎসর ৫০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ টন (প্রতি টন প্রায় ২৭॥০ মণ) পটাস উঠে।

কেনিট্।—ইহাতে পট্যাসের ভাগ তত অধিক নহে, কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, যে ক্ষেত্রে ইহা প্রদত্ত হয় তজ্জাত ফসলের পক্ষে উহা কীটও ছত্রক বিনাশকারীরূপে কার্য্য করে। কার্পাসের ক্ষেত্রে এতদ্দারা বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

মিউরিয়েট-অব-পট্যাস (Muriate of potash) ইহার মধ্যে প্রায় ৫০ ভাগ পট্যাস থাকে। উদ্ভিজ্জ ভস্মে বড় জোড় ৮।৯ ভাগ মাত্র পট্যাস দেখা যায়, এজন্য ভস্ম প্রয়োগে মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহা বলিয়াছি। পটাসের জন্য পটাস-পদার্থ ব্যবহার করিতে হইলে যতটা নির্ম্মল ও শোধিত পট্যাস পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত এবং তাহাই

ব্যবহার করিতে হয়। খনিজ পটাস্ শীঘ্রই গলিত হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায় অথচ তদ্দ্বারা মৃত্তিকার প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না।

সল্‌ফেট্‌-অব-পটাস্ (**Sulphate of potash**) ইহার মধ্যে ৫০ হইতে ৫৫ ভাগ প্রকৃত পটাস্ সদৃশ ব্যবহার্য্য নাইট্রেট্‌-অব-পটাস্ (Nitrate of potash) থাকে। ইহা আমাদিগের সোরা। ক্ষেত্রে সোরা প্রদান করিলে পটাস, তৎসঙ্গে কিছু নাইট্রোজেনও দেওয়া হয়, কারণ ইহার মধ্যে ৪৩।৪৪ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। অস্থিচূর্ণ বা তজ্জাত অপর সারের সহিত সোরা ব্যবহার করিলে মাটিতে তিনটী বিশিষ্ট সারের সমাবেশ হয়।

পূর্ণ-খাদ্য।—পূর্ব্বালোচিত কয়টী দ্রব্যই উদ্ভিদের খাদ্য তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দ্রব্যই যে এক একটী বিশেষ গুণের আধার তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই জন্য মাটিতে দ্রব্যবিশেষ সংযোজিত হইলে উদ্ভিদ-শরীরে এক বিষয়েরই ফল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পূর্ণখাদ্য প্রদত্ত হইলে উদ্ভিদের খাদ্যবিষয়ক তাবৎ অভাব পরিপূরিত হয়। নাইট্রোজেনপ্রধান-সার দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়তা হয়, গাছ সুশ্রী হয়, কিন্তু তাহার সহিত পটাস না থাকিলে শাখা প্রশাখাদি দীর্ঘ ও দৃঢ় হয় না। অন্যদিকে আবার ফস্ফরিক পদার্থ না থাকিলে ফল অধিক হয় না, ফল বড় হয় না। প্রতি বৎসরই কেবল ফস্ফরিক সার দিলে প্রথম দুই এক বৎসর তদ্দ্বারা ফলনের উপকার হয়, কিন্তু তৎপরে ফলন হ্রাস পায়, ফসলও তাদৃশ পরিপুষ্ট হয় না। সেইরূপ কেবল পটাস সংযোগে সকল সময়ে গাছের বৃদ্ধি বা ফসলের বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না বরং জমিতে যে কিছু নাইট্রোজেন

বা ফস্ফরিক পদার্থ থাকে, তাহাও ইত্যবসরে ব্যয়িত হইয়া যায়। অতঃপর তাহাতে আর কোন ফসলই জন্মিতে পারে না। এ প্রণালীতে সার প্রদান করিলে পদার্থবিশেষের প্রাধান্য হেতু ফসলের সকল অভাব পরিপূরিত হয় না। সার প্রদান করিবার উদ্দেশ্যই যখন ক্ষেত্রে উদ্ভিদখাদ্যের সংস্থান করিয়া দেওয়া, তখন সেই খাদ্য যাহাতে একাঙ্গমূলক না হইয়া পূর্ণখাদ্য হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত তিনটী বিশেষ বিশেষ পদার্থের সমাবিষ্ট সার প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করা উচিত কিম্বা উক্ত তিন সারই যথাসময়ে দিতে হইবে।

পশু-বর্জ্জনা।—গবাদি পশুদিগের আবর্জ্জনাকে পূর্ণসার মনে করা যাইতে পারে, কারণ তাহাতে উল্লিখিত তিনটী সামগ্রীই বিদ্যমান কিন্তু উহার বিক্ষিপ্ততাহেতু সমধিক পরিমাণে ব্যবহার না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না কিন্তু আবার অধিক পরিমাণে সংযোজিত হইলে মাটির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে—ইহাও আশঙ্কার কথা। শোধিত কৃত্রিম সার ব্যবহারে মাটির স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না অথচ উদ্ভিদগণেরও উপকার দর্শিয়া থাকে। গোময় বা অশ্বনাদি মধ্যে বিস্তর অজীর্ণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে, অশ্বনাদি মধ্যে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই জন্য, সঞ্চিত থাকিলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে সেই স্তূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং বাষ্পোদ্গীরণ করিতে থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, অশ্বজাতির পরিপাক শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ। অশ্বনাদি শীঘ্রই উত্তপ্ত হইয়া উঠে বলিয়া লোকে সহজে জীবিত গাছপালায় উহা প্রদান করিতে সাহসী হয় না। বাস্তবিক ইহা দেখাও গিয়াছে যে, টাট্‌কা আস্তাবলের বর্জ্জনা বা আবর্জ্জনা (Stabling) কোন

বৃক্ষমূলে দিলে সে গাছ ২।১ দিন মধ্যে ঝিমাইয়া পড়ে। গোময় তত বিক্ষিপ্ত নহে। গোজাতির পরিপাকশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া উহারা যাহা কিছু ভক্ষণ করে, তাহাই উত্তমরূপে হজম করিতে সক্ষম, তথাপি তাহাদিগের নাদি মধ্যে অনেক শস্য অজীর্ণাবস্থায় পরিত্যক্ত হয়, এবং সেই সকল শস্য ভূমিতে স্থান পাইলে অঙ্কুরিত হয়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ছাগ ও মেষদিগের নাদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনীভূত ও নীরস। ইহারা দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে বলিয়া ভুক্তখাদ্য সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া জঠরপ্রবিষ্ট হয়। অতঃপর সেখানেও পরিপাক হয়। এই দুই কারণে ইহাদিগের নাদি এত দৃঢ় ও শুষ্ক হয়। ইহারা অতি অল্প জল পান করে, ইহাও দৃঢ়তার ও শুষ্কতার অন্যতম কারণ।

উল্লিখিত কয়জাতীয় ও তাবৎ প্রাণীজ সার স্তূপীকৃতভাবে অল্লাধিককাল থাকিলে আরও জীর্ণ হয়, তদন্তর্গত জৈবপদার্থ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য অনেক সময় পুরাতন সার ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইয়া থাকে। নূতন-সার ও পুরাতন-সার মধ্যে গুণের ও উদ্দীপকতার অনেক ইতরবিশেষ হয়।* এ বিষয়ে কিছু মতভেদও আছে। স্যার হম্‌ফ্রি (ডেভী Sir Humphrey Davy) বলেন যে, উক্ত সার পুরাতন হইলে তদন্তর্গত নাইট্রোজেন, য়্যামোনিয়ায় পরিণত হইয়া চুয়াইয়া রসের সহিত, বহির্গত হইয়া যায় কিম্বা শুকাইয়া বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, ফলতঃ সারের শক্তি হ্রাস পায়। উক্ত সারের সহিত পটাস্ বা উদ্ভিজ্জভস্ম বা ঈষৎ চুণ মিশ্রিত থাকিলে য়্যামোনিয়া পলায়ন করিতে পারে না। ভিলী (M. Ville) সাহেবও উক্ত মত অনেকটা পোষণ করেন। তিনিও বলেন যে, প্রাণীজ-সার

* মৎকৃত 'কৃষিক্ষেত্র' ১১৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

টাটকা অবস্থাতেই ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দেওয়া ভাল। টাটকা সার প্রসারিত হইলে তদন্তর্গত য়্যামোনিয়া নষ্ট হইতে না পাইয়া ভূমির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে এবং উপরিভাগের মৃত্তিকা দ্বারা আবরিত হইয়া ভালরূপেই সংরক্ষিত হয়। তবে ঈদৃশ সার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিবার পক্ষে একটী অসুবিধা এই যে, উহা সহজে মাটির সহিত ভালরূপে মিশিতে পারে না, বরং মাটির সংস্পর্শে আসিয়া জমাট বাঁধিয়া ডাল পাকাইয়া যায়। অতঃপর বহুবার ঘন ঘন হলচালনাদি না হইলে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া মাটির সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না।

খৈলকে যুক্ত-সার মধ্যে গণ্য করা যায়, কারণ উহার মধ্যে তিন প্রকার উদ্ভিদখাদ্যই বর্ত্তমান। তাহা ব্যতীত, জৈব পদার্থও যথেষ্ট থাকে। খৈল মধ্যে পাঁচ ভাগেরও অধিক নাইট্রোজেন থাকে, এজন্য উহা নাইট্রোজেনপ্রধান-সার মধ্যে পরিগণিত।

যাহা হউক, এই সকল জৈব সার বহু পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু কৃত্রিম সার অল্প প্রয়োগে অধিক ফল পাওয়া যায়। জৈব সার সম্বন্ধে আর একটী বিষম অসুবিধা এই যে, কোন স্থানে এক দফায় ২০।৫০ বা ১০০ মণ গোবর বা খৈল পাওয়া পল্লীগ্রাম-বাসীদিগের পক্ষে একরূপ অসম্ভব কিন্তু কৃত্রিম সার ২।৫ মণ দ্বারা সে কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, উপরন্তু সহর হইতে ইচ্ছামত ক্রয় করিতে পারা যায় এবং অনেক অল্প খরচে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়। এই সকল কারণে আমরা কৃত্রিম বা শোধিত সারের এত পক্ষপাতী। সমাবিষ্ট (Concentrated) সারের সপক্ষে আর একটী কথা এই যে, যাঁহারা এই সকল সামগ্রী বিক্রয় করেন তাঁহারা ক্রেতাকে বলিয়া দেন যে, বিক্রীত কোন্ সারে কত পরিমাণ বিশেষ

[illegible] বর্ত্তমান। বিশেষ বিশেষ যবক্ষারিক সারে কত পরিমাণ যবক্ষার বা অ্যামোনিয়া, স্ফুরক বা ফস্ফেটিক-সারে কত পরিমাণ ফস্ফরিক-অ্যাসিড্, বিশেষ বিশেষ পট্যাস-সারে কত পরিমাণ পট্যাস আছে, প্রত্যেক সারে তাহা লিখিত থাকে, এজন্য পদার্থবিশেষের ভাগ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ক্রেতাকে ক্লেশ পাইতে হয় না, বরং সেই সকল সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিয়া আপন আলয়ে নিজ নিজ ফসলের উপযোগী করিয়া মিশ্র প্রস্তুত করিতে পারেন। সকল খৈল বা সকল গোময় সমশ্রেণীর নহে, অথচ বিশ্লেষণ করিবার উপায়ও সকলের নাই। এই জন্য এই শ্রেণীর সার ব্যবহার, অন্ধকারে ইষ্টক নিক্ষেপবৎ, অনিশ্চিত হইয়া থাকে। তাহা বলিয়া এই জাতীয় সার যে বর্জ্জনীয় তাহা নহে। এ সকল সার প্রয়োগে মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশ করিয়া দেওয়া হয়। উদ্ভিজ্জ-পদার্থবর্জ্জিত মৃত্তিকা গলনীয় সার ধারণ করিয়া রাখিতে অক্ষম, ইহা যেন মনে থাকে। মাটিতে 'হিউমস্' নামক যে প্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে তাহা জৈব-পদার্থসঞ্জাত এবং উক্ত পদার্থ হইতে humic acid নামক দ্রাবক উদ্ভূত হইয়া ভূগর্ভস্থ ভূতপূর্ব্ব ফসল বা অপরাপর উদ্ভিদের শিকড়াদিকে দ্রবীভূত করিয়া দেয়। অতঃপর ইহাও দেখিতে হইবে যে, ভূগর্ভে জৈব পদার্থের সমাবেশ না থাকিলে জীবাণুগণ জীবিত থাকিতে পারে না, এবং যে কিছু জীবাণু থাকে তাহাও ক্রমে বিলুপ্ত হয়। ক্ষেত্রে যে কিছু সারই প্রদত্ত হউক, তৎসমুদায় উত্তমরূপে জীর্ণ হইয়া নাইট্রেট নামক পদার্থে পরিণত না হইলে উদ্ভিদগণ কোন উপকার পায় না। এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, নাইট্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়া, এবং অ্যামোনিয়া হইতে

নাইট্রেট উদ্ভূত হয়। এই নাইট্রেটই উদ্ভিদের প্রকৃত খাদ্য এবং ইহাদেরই মধ্যস্থতায় বা সাহায্যে, ভূগর্ভের মধ্যে, আহরণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয়। যতক্ষণ সে অবস্থায় পরিণত না হয়, ততক্ষণ কোন উদ্ভিদখাদ্য—যতই পুষ্টিকর বা মূল্যবান হউক—উদ্ভিদের সেই সকল সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম কৈশিকমূলে (hair root) প্রবেশ করিতে পারে না। সেই সকল মূলও এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, যে-সে পদার্থ অবাধে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কৈশিক মূলগণের শেষাগ্রভাগে একটী করিয়া মসৃণ প্রলেপবৎ পদার্থ থাকে, তাহারাই উদ্ভিদমধ্যে যে-সে দ্রব্য প্রবেশের প্রতিরোধক।* উদ্ভিদ-মূলের শেষাগ্রভাগে যে আবরণের উল্লেখ করিলাম তাহা নিতান্ত কোমল। কোনরূপে উক্ত শেষাগ্রভাগে আঘাত লাগিলে সেস্থান অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, ফলতঃ আপাততঃ সে স্থান দ্বারা উদ্ভিদ

---

* মূলের শেষাগ্রভাগে যে মসৃণ আবরণের উল্লেখ করা গিয়াছে মৃত্তিকা-ভ্যন্তরস্থ মূলে তাহা সহজ চক্ষে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না কারণ, সে সকল মূল নিতান্ত সূক্ষ্ম। তাহা ব্যতীত, মাটির ভিতরে থাকায় বর্ণের পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। অনেক বৃক্ষলতা—লাউ, কুমড়া, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতির গ্রন্থি হইতে ঝুরি উদ্গত হয়। উহাদিগকে উদ্ভিদশাস্ত্রানুসারে adventitious root কহে। উদ্ভিদশাস্ত্রবিদ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার বাঙ্গালা প্রতি-শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন 'আস্থানিক মূল'। উক্ত শব্দটী ভাবব্যঞ্জক বলিয়া আমার মনে হয় না। বাঙ্গালায় ঝুরি শব্দ প্রচলিত থাকায় অপর অর্থহীন শব্দের সৃষ্টি করায় লাভ নাই। উক্ত ঝুরি শব্দকে শুদ্ধভাষায় 'গ্রন্থি মূল' বলিলে সঙ্গত হয়। বাস্তবিক, উক্ত মূলসকল উদ্ভিদের শাখাপ্রশাখায় গ্রন্থি বা গাঁট হইতে উদ্গত হয়। ইহাদিগের শেষাগ্র ঘন সবুজ বর্ণের হয় সুতরাং অপরাংশ হইতে অনায়াসে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ঝুরিগুলি ভূমি সংলগ্ন হইলে স্বতন্ত্র মূলে পরিণত হয়।

আর খাদ্য আহরণ করিতে পারে না, কিন্তু অচিরে সেই স্থানে দুই একটী নূতন কেঁকড়ি উদ্গত হয় এবং তদ্দ্বারা আবার আহরণ-ক্রিয়া চলিতে থাকে। এতদ্দ্বারা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি যে, কোন উদ্ভিদই স্থূল সামগ্রী—তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক—অবাধে আহরণ করিতে পারে না। উদ্ভিদের কোন অংশ উত্তম ভস্মে পরিণত হইবার পর তদন্তর্গত স্থূল পদার্থপুঞ্জের ঘনতা ভাঙ্গিয়া দিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেই সকল পরমাণু কত সূক্ষ্ম, সামান্য বাতাসে উড়িয়া যায়, জলেও ভাসিতে থাকে! উক্ত পরমাণুদিগকে পৃথক করিয়া দিলে সহজ চক্ষে তাহাদিগের অস্তিত্বই অনুভূত হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

চোনা।—ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর বিষ্ঠামধ্যে যেমন তারতম্য আছে, তাহাদিগের আহারীয় পদার্থের ইতরবিশেষে যেরূপ সারের গুণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, চোনা সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। সকল জাতীয় প্রাণীর চোনা, সার হিসাবে সমান নহে।

উদ্ভিদখাদ্য হিসাবে নাদী অপেক্ষা চোনা অধিক মূল্যবান, কিন্তু চোনা মধ্যে ফস্‌ফরিক্-য়্যাসিড্ অতি কম পরিমাণে থাকে এবং কোন কোন প্রাণীর চোনায় তাহার পরিমাণ নামমাত্র থাকে। এই জন্য, সাররূপে এক মাত্র চোনার দ্বারা বড় উপকার পাওয়া যায় না। সার উদ্দেশ্যে চোনা ব্যবহার করিতে হইলে, তাহার সহিত গোবরাদি মিশ্রিত করা উচিত। কৃষকের পক্ষে

চোনার এত প্রয়োজন থাকিলেও, উহার অধিকাংশ নষ্টই হইয়া থাকে। পশুদিগের বাসস্থানে উহাদিগের পরিত্যক্ত মূত্র সঞ্চিত হইবার জন্য সাধারণতঃ কোন বন্দোবস্ত থাকিতে দেখা যায় না, ফলতঃ তাহা ভূমিতেই শোষিত হইয়া যায়। যে সকল পশুর আরামের জন্য গৃহমধ্যে বিচালি বা ছাই প্রসারিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা-দিগের চোনা খড়ে বা ভস্মে শোষিত হইয়া থাকে। সেই খড় বা ভস্ম গোবরের সহিত মিশ্রিত হইলে সারের উত্তেজকতা বৃদ্ধি পায়।

চোনা-ভেদ।—চোনা ঘন হইলে সমধিক পরিমাণে সারবান হইয়া থাকে, কিন্তু চোনা লঘু হইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়। যে পশু অধিক পরিমাণে জলপান করে, তাহার চোনা অধিক হয়, ফলতঃ তাহাতে সারের পরিমাণ কম থাকে; আর যে পশু জল অল্প পান করে, তাহার চোনা অল্প হয়, কিন্তু তাহা অধিক সারবান্ হয়। এতদ্দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, চোনার সহিত যে পরিমাণ স্থূল পদার্থ থাকা উচিত তাহা থাকিবেই; তবে ঘন চোনাতে অধিক, আর পাতলা চোনাতে অল্প থাকে। এই জন্য দুই প্রকার চোনা ব্যবহারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল হয়। ঘন চোনাকে পাতলা চোনার ওজন-মত জলমিশ্রিত করিয়া লইলে পাতলা চোনার মত ফল পাওয়া যায়, অন্যদিকে পাতলা চোনা ব্যবহার করিয়া ঘন চোনার ন্যায় ফললাভ করিতে হইলে পাতলা চোনা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়।

চোনার মধ্যে সোডা, পটাস, চুণ প্রভৃতি লবণজাতীয় (alkali) পদার্থের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, এই কারণে কেবলমাত্র চোনা কোন উদ্ভিদের গোড়ায় প্রদান করিলে, সে উদ্ভিদ ঝিমাইয়া যায় কিম্বা মরিয়া যায়। কোন কোমল উদ্ভিদের মূলে চোনা প্রদত্ত

হইলে সে উদ্ভিদ একদিন বা দুই দিনের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া পড়ে, কিন্তু বড় গাছে প্রদান করিলে তাহার ফল তত শীঘ্র অনুভূত হয় না। আবার কোমল চারায় যদি ঘন চোনা দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা যত শীঘ্র মরণোন্মুখ হয়, পাতলা চোনা দিলে কিম্বা ঘন চোনাকে পাতলা করিয়া দিলে তত শীঘ্র তাহার ফল দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন তৃণময় ভূমিতে দুই চারিদিন চোনা বা মানুষের মূত্র পতিত হইলে সে স্থানের তৃণ 'ঝান' খাইয়া যায় অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়া ক্রমে মরিয়া যায় ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এইরূপে স্থানীয় তৃণ যে 'ঝান' খাইয়া যায়, তাহার মূল কারণ—চোনা বা মূত্রান্তর্গত লবণ-জাতীয় পদার্থের আতিশয্য।

চোনা মধ্যে লবণ-জাতীয় পদার্থের আতিশয্য এবং নাইট্রোজেনের অল্পতা ও ফস্‌ফরিক য়্যাসিডের যৎসামান্যতা বা অভাব-হেতু উহাকে পূর্ণসার (perfect plant food) না বলিয়া আংশিক সার বা সারের উপকরণ বলাই উচিত। যে কোন সারই হউক, সারের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরিক্ য়্যায়িড ও লবণজাতীয় পদার্থের একত্র সমাবেশ না হইলে কোন সারকেই পূর্ণসার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না। যে সার মধ্যে নাইট্রোজেন নাই, অথচ অন্যান্য সকল পদার্থই বিদ্যমান, তাহাতে নাইট্রোজেন উৎপন্নকারী অথবা নাইট্রোজেন-সম্ভূত-পদার্থের নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে যে সার মধ্যে যে যে পদার্থের অভাব পরিলক্ষিত হইবে, তাহাতে সেই সেই বিশেষ পদার্থ নিয়োজিত করিলে তবে সার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। গোমায়ু, এবং অশ্ব, মেষ, ছাগ প্রভৃতির নাদীতে ফস্‌ফরিক-য়্যাসিড ও নাইট্রোজেন

সর্ব্বাধিক পরিমাণে অবস্থিত। কিন্তু উক্ত পদার্থের সহিত চোনা সম্মিলিত না হইলে সার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সারের পূর্ণতা সংসাধিত করিবার জন্য পুরীষ ও মূত্র, এতদুভয় পদার্থেরই সমাবেশ থাকা উচিত।

আবর্জ্জনা।—প্রাণীজাত সার বহু প্রাচীনকাল হইতেই কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা যে কেবল ভারতবর্ষেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবীতে ইহার ব্যবহার অতি প্রাচীনকালেও ছিল, এখনও আছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে প্রাণীজ সারের অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও পরীক্ষা চলিতেছে, কিন্তু, কোন পরীক্ষকই ইহাকে অকর্ম্মণ্য বা অনাবশ্যকবোধে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, বরং কার্য্যক্ষেত্রে এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহার উপকারিতা সপ্রমাণ হইতেছে, তন্নিবন্ধন ইহার প্রসারও বৃদ্ধি পাইতেছে। লোকে প্রাণীজ সারের উপকারিতা যতই হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, ততই ইহার আদর বৃদ্ধি পাইতেছে। এদেশেও ব্যবহার আছে, কিন্তু সাধারণতঃ লোকে ইহার গূঢ়তত্ত্ব অবগত নহে এবং ইহাকে সংস্কৃত করিয়া লইতে শিখে নাই। এই কারণে অনেক স্থলে গোশালার আবর্জ্জনা—নাদী, চোনা ও তৎসংসর্গীয় তৃণাদির অপচয় হইয়া থাকে। ঈদৃশ কৃষিকার্য্যোপযোগী মহামূল্য সারের অপচয় দেশের পক্ষে মহা অকল্যাণকর। উক্ত সার সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহা অতি অনায়াস-লভ্য। কি ধনী, কি পর্ণকুটীরবাসী, সকলেই ইহা সহজে সংগ্রহ করিতে পারেন। এই সারের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিলে সকলেই ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবেন এবং যাহাতে ইহার অপচয় না হইয়া প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয় তাহার

চেষ্টা করিবেন, কিম্বা নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলে অপরের নিকট বিক্রয় করিয়াও লাভবান হইতে পারিবেন।

গবাদি পশুশালার আবর্জ্জনা অপরাপর সারের স্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্নরূপে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সারের অবস্থান্তরের সহিত উহার কার্য্যকারিতার ইতরবিশেষ হয়। সদ্য বা টাট্‌কা সারের একগুণ, আবার পুরাতন ও বিগলিত সারের অন্যগুণ। সদ্য বা টাট্‌কা ও পুরাতন বর্জ্জনা মধ্যে গুণের যে তারতম্য হয় তাহার একমাত্র কারণ—ভৌতিক-ক্রিয়া। ভৌতিক-ক্রিয়াবশে বর্জ্জনা রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে ফলাফলের বিশেষ তারতম্য হইয়া থাকে। প্রাণীজ-বর্জ্জনা উত্তম ও ফলপ্রদ বলিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, কারণ উদ্ভিদের জীবনধারণোপযোগী যে যে পদার্থ থাকিলে উদ্ভিদগণ পুষ্টি লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় পদার্থই ইহাতে মূলতঃ অবস্থিত। তদ্ভিন্ন ইহা দেখা যায় যে, কোন দুইটী স্বতন্ত্র পশুর মলমূত্র সমগুণাপন্ন নহে। দুইটী পশুর নাদী ও চোনাকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করিলে কিম্বা দুইটী উদ্ভিদে পৃথকরূপে প্রয়োগ করিলে ফল বিভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জানিয়া রাখা উচিত যে, এক জাতীয় পশুর গোময় হইতেই যে তৎসমুদায়ের গুণ একই প্রকারের হইবে তাহা নহে, তবে সাম্যতা বহু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

ক্ষেত্রে সার প্রদান করিলে, ফসলের ফলন অধিক হয়, ইহাও কৃষকগণ জানে কিন্তু কৃষক সার পাইবে কোথায়? নানাবিধ সার খরিদ করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করা কৃষকের পক্ষে অসম্ভব। যে নিজে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে ক্ষেত্রকে খাওয়াইবে কিরূপে? কৃষকের ভরসা গোবর, কিন্তু রন্ধন-কার্য্যের

জন্য তাহাকে তাবৎ গোময় জ্বালাইতে হয়, অবশিষ্ট যে ছাই থাকে তাহাই ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইয়া থাকে।* কেবল ছাই দ্বারা ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ফসলের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য মৃত্তিকা মধ্যে যবক্ষারজান থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রজ্জ্বলন-কালে গোময় অথবা যাবৎ জৈবপদার্থ হইতে যবক্ষারজান বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, তখন কেবলমাত্র যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ফস্‌ফরাস ও পট্যাস থাকে, তৎসঙ্গে অপরাপর খনিজ পদার্থও থাকে। ফস্‌ফরস, পট্যাস্ প্রভৃতি স্থূল মৌলিক পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদের সকল অভাব পূরণ হয় না। স্থূলপদার্থ ক্ষেত্রে প্রদান না করিলেও ফসলের তাদৃশ ক্ষতি হয় না, কারণ এ সকল পদার্থ মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ অল্পাধিক পরিমাণে থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু উপরিতলের যবক্ষারজান বড় শীঘ্র নিঃশেষিত হইয়া যায়, এই জন্য ক্ষেত্রে তজ্জাতীয় সার বহুল পরিমাণে দিবার ব্যবস্থা আছে। কৃষকেরা যদি গোবর না জ্বালাইয়া সদ্যই তাহা ক্ষেত্রে

---

* এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সকল কৃষকের ক্ষেত্রই যে বাসস্থানের সন্নিকটে তাহা নহে। বাসস্থান হইতে ক্ষেত্র দূর হইলে, ছাই বা অঙ্গার আবর্জ্জনা তথায় লইয়া যাওয়া কৃষকের পক্ষে সহজ কথা নহে। এই কারণে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, এই সকল সার বা আবর্জ্জনা অপচয় হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের দূরত্ব সার ব্যবহারের একটী বিষম অন্তরায়। সম্বৎসরের সঞ্চিত ২৪ গাড়ী সামগ্রীর জন্য কোন ব্যক্তি একখানা গো যান বারো মাস রক্ষা করিতে পারে না। তাহা ব্যতীত, খানা-ডোবাসমাকীর্ণ অসমতল মাট-ঘাট অতিক্রম করিয়া গো শকটকে ক্ষেত্রে লইয়া পৌছানও অসুবিধাজনক। ঈদৃশ ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা কারণে ইচ্ছা ও সুবিধা থাকিতেও লোকে গার্হস্থ্য আবর্জ্জনাকে ক্ষেত্রে প্রদান করিয়া উঠিতে পারে না।

প্রদান করিতে পারে তাহা হইলে ক্ষেত্রের যবক্ষারজানের অভাব কতকটা বিদূরিত হইতে পারে।

কেবল গোময় হইলেই যে কৃষকের সকল আশা পূর্ণ হইবে তাহা নহে। গোময়ের গুণবত্তানুসারে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতার ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৃদ্ধ ও রুগ্ন গরুর গোময় ও চোনা যেরূপ সারবান হইয়া থাকে, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী পশুর মল-মূত্র সেরূপ হয় না। তাহার কারণ এই যে, পরিপাক শক্তির অল্পতাহেতু প্রথমোক্ত পশুগণ ভুক্ত-সামগ্রীকে উত্তমরূপে পরিপাক করিতে পারে না, ফলতঃ তদন্তর্গত পুষ্টিকর ভাগ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শরীর মধ্যে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু শেষোক্ত পশুগণ ভুক্ত-দ্রব্যকে উত্তমরূপে পরিপাক করে এবং তাহার প্রায় সমুদায় সারভাগ শরীরমধ্যে পরিশোষিত হয়। এই কারণে শেষোক্ত পশুদিগের মল-মুত্র তেমন সারবান হয় না, কিন্তু প্রথমোক্ত পশুগণ একদিকে যেমন উত্তমরূপে পরিপাক করিতে পারে না, অন্যদিকে আবার ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ অধিক পরিশোষণ করিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং ইহাদিগের বর্জ্জনায় সমধিক পরিমাণে সার-ভাগ পাওয়া যায়।

পশুগণকে যে সকল আহারীয় দেওয়া যায়, অথবা তাহারা যাহা কিছু পানাহার করে তাহার সকলগুলিই যে পুষ্টিকর তাহা নহে। যে পশু যে পরিমাণে পুষ্টিকর আহার পায়, সে পশুর মলমূত্রে সেই অনুপাতে সার-ভাগ পাওয়া গিয়া থাকে। দরিদ্র লোকের গৃহপালিত পশুগণকে প্রায় মাঠে-ঘাটে বিচরণ করিয়া উদর পুরণ করিতে হয়, ইহাদিগের অনেকেই খৈলের স্বাদ জানেনা, কিন্তু যে সকল পশু খৈল-সম্বলিত-জাব্ পায়, তাহাদিগের বর্জ্জনা সমধিক

তেজস্কর হয়। সর্ষপ, মাঠকলাই, তিল প্রভৃতি তৈলদ শস্যজাত খৈলের মধ্যে সমূহ পরিমাণে যবক্ষারজান থাকে বলিয়া এই জাতীয় খৈল যে সকল পশু খাইতে পায়, তাহারা নধর ও বলিষ্ঠ হয় এবং তাহাদিগের বর্জ্জনাও ক্ষেত্রের পক্ষে মহামূল্য সার বলিয়া জানিতে হইবে। এ সকল কথা কৃষকগণকে বুঝাইয়া দেয় কে?*

বর্জ্জনা-বিভাগ।—বর্জ্জনা মধ্যে যে কয়টী পদার্থ আছে তাহাদিগকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১ম—স্থূল বা কঠিন (Solid)

২য়—তরল (Liquid)

৩য়—গোয়ালে প্রসারিত বিচালি, ঘাস বা অন্য কোন বস্তু যাহাতে পশুগণ শয়ন করে। ইংরাজিতে ইহাকে Litter কহে।

একজাতীয় পশুর বর্জ্জনা হইলেই যে, তজ্জাতীয় যাবতীয় পশুর বর্জ্জনা সমগুণসম্পন্ন নহে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উল্লিখিত তিনটী পদার্থের মধ্যে পদার্থবিশেষেরই পরিমাণের ইতরবিশেষে অথবা পদার্থ-বিশেষেরই গুণের তারতম্যে সারের গুণবত্তায় ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। আরও সরল ভাবে বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, উক্ত তিনটী জিনিসের মধ্যে একটী বা দুইটী জিনিস সারের মধ্যে অল্প বা অধিক পরিমাণে থাকিলে যেমন সারের গুণের তারতম্য হয়, তেমনই উক্ত তিনটী জিনিসের মধ্যে একটী বা দুইটীর সারবত্তা অল্প বা অধিক হইলে সারের প্রকৃতি-

* উদ্ভিদের পুষ্টিকর সার উৎপন্ন করিতে হইলে পশুদিগকে প্রচুর ও উত্তম আহার দিতে হয়, এতদ্দ্বারা পশুর উপকার হয়, ভূমির উপকার হয়, উদ্ভিদের উপকার হয়। সুতরাং পশুদিগকে উত্তমরূপে আহার দেওয়ায় সমূহ লাভ আছে।

গত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সম্যকরূপে ইহার আলোচনা করিতে হইলে উক্ত তিনটীর সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা উচিত।

১ম,—স্থূল পদার্থ। প্রাণীদিগের মলমূত্রে যে সারের অংশ থাকে, তাহার মূলীভূত কারণ—নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক-য়্যাসিড্ ও পটাস্। সার মধ্যে এই তিনটী পদার্থের পরিমাণ বিষয়ে ইতর-বিশেষ হইলে, কিম্বা সাময়িক অবস্থার বিভিন্নতা থাকিলে সারকেও তদনুগত হইতে হইবে।

গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি পশুর সারে গুণের বিভিন্নতা আছে ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। তাহা ব্যতীত ইহা ও জ্ঞাতব্য যে, সেই সারের উপকরণসমূহের পরিমাণ মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। মনে করিয়া লওয়া যাউক, তিনটী গাভীকে সমপরিমাণে একই জিনিসের জাব দেওয়া গেল। তাহা বলিয়া যে, সেই তিনটী গাভীর নাদী ও চোনা সমগুণসম্পন্ন হইবে এমন কোন কথা নাই। উক্ত তিনটী গাভীর মধ্যে একটী গাভী ভুক্ত জিনিসকে উত্তমরূপে পরিপাক করিল, দ্বিতীয় গাভী অল্প-ক্ষুধা-হেতু অথবা অন্য কোন কারণে সম্পূর্ণরূপে না পারিয়া মধ্যবিধরূপে পরিপাক করিল এবং তৃতীয় গাভী অসুস্থতা বা বার্দ্ধক্যনিবন্ধন যৎসামান্যই হজম করিতে পারিল। একই খাদ্য ভোজন করিয়া তিনটী গাভী ভুক্ত দ্রব্যকে সমভাবে পরিপাক করিতে পারিল না। এ অবস্থায় উক্ত তিনটী গাভীর মধ্যে কোন্ গাভীর নাদী ও চোনা সাররূপে মূল্যবান? উত্তরে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিবেন,—প্রথম গাভীর; অল্পজ্ঞ বলিবেন,—দ্বিতীয় গাভীর এবং বিজ্ঞ বলিবেন,—তৃতীয় গাভীর। আমি কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির কথাই শিরোধার্য্য করিব, তাহার কারণ এই যে—

তৃতীয় গাভীর ত্যক্ত যে সার তাহার অধিকাংশ অপাচিত, ফলতঃ তাহাতে অজীর্ণ পদার্থের পরিমাণ সমধিক অবস্থিত। ভুক্ত পদার্থ সম্যকভাবে পরিপাক হইলে সার মধ্যে পাচ্য পদার্থের পরিমাণ হ্রাস প্রাইয়া থাকে। এই কারণে তৃতীয় গাভীর সার উত্তম। এই নিয়মানুসারে দ্বিতীয় গাভীর সার মধ্যম এবং প্রথম গাভীর সার নিকৃষ্ট।

সকল জাতীয় জীবের পরিপাক-শক্তি সমান নহে। অশ্ব-জাতির পরিপাক-শক্তি গো-জাতির পরিপাক-শক্তি অপেক্ষা অনেক কম, এই জন্য অশ্বজাত নাদী অপেক্ষা গোময় মধ্যে সুপাচিত পদার্থের পরিমাণ অধিক। এইরূপ, জীবের পরিপাক-শক্তির ন্যূনাধিক্যহেতু সার মধ্যে গুণের তারতম্য হইয়া থাকে।

পরিপাক-শক্তির বিশেষত্বে যেমন একদিকে সারের গুণাগুণের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তেমনি অন্যদিকে অযত্ন অপেক্ষা সযত্ন-রক্ষিত, পশুর সার অনেকাংশে মূল্যবান। গরিবদুঃখীদিগের পশুগণ যথেষ্ট পরিমাণে আহার পায় না, তাহা ব্যতীত তাহারা পশুদিগকে তাদৃশ পুষ্টিকর আহার্য্য দিতে পারেনা। ধনীদিগের পশুগণ পেট ভরিয়া আহার পায় এবং যে আহার্য্য পায় তাহাও প্রায় পুষ্টিকর, এই কারণে ইহাদিগের সারে যে অজীর্ণ পদার্থ থাকে তাহা অনেক পরিমাণে সারবান।

পশুর বয়ঃক্রম অনুসারে সারের গুণাগুণের তারতম্য হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান পশুর সারমধ্যে অপাচিত পদার্থের অংশ বড় কম থাকে, কিন্তু যে সকল পশু বৃদ্ধির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে বা শেষ সীমা অতিক্রম করিয়াছে তাহাদিগের সার মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী মৌলিক পদার্থ,—নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক-য়্যাসিড্ ও

পটাস—অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে অবস্থিত। তাহার কারণ এই যে, বর্দ্ধমান পশুর অবয়ব সমূহের পুষ্টি ও পূর্ণতার জন্য ভুক্ত পদার্থের অজৈবভাগ সমধিক পরিমাণে শরীর মধ্যে থাকিয়া যায়, ফলতঃ বর্জ্জিতাংশে অজৈবভাগের অল্পতা পরিলক্ষিত হয়। বয়োবৃদ্ধ পশুগণের অস্থি, চর্ম্ম, লোম, ক্ষুর প্রভৃতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং আর তাহাদিগের বড় একটা অজৈব পদার্থের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু অল্প বয়স্কগণের অবয়বসমূহের পুষ্টি ও পরিবৃদ্ধির জন্য বহু পরিমাণে অজৈব পদার্থের প্রয়োজন থাকে, সুতরাং তাহাদিগের শরীরমধ্যে সেই সকল পদার্থ থাকিয়া গিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবর্দ্ধনে নিয়োজিত হয়। সকল জীবই স্বভাবধর্ম্মে পরিণতবয়স্ক হইলে মূলতঃ আর বর্দ্ধিত হয় না, হ্রাস প্রাপ্তও হয় না। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবৃদ্ধি এক, এবং শারীরিক স্থূলতা প্রাপ্তি আর। বৃদ্ধিরুদ্ধ পশুদিগের অঙ্গসৌষ্টবের পূর্ণতা হইয়াছে অথচ তাহারা ভুক্ত সামগ্রীর অজৈবাংশ অল্প পরিমাণেও শরীর মধ্যে রাখে কেন,—একথা অনেকের মনে হইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, শরীর হইতে সকল সময় অনেক অজৈব পদার্থ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। হ্রাসপ্রাপ্ত সামগ্রীর পরিপূরণের জন্য অজৈব পদার্থের আবশ্যক হয়। মানুষে নখ ও চুল কর্ত্তন করিয়া ফেলে, কিন্তু যতবার কর্ত্তন করুক, নখ ও কেশ আবার গজাইবে। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইলে কিম্বা কোন স্থানে স্ফোটক হইলে, শরীর হইতে যে রক্তপুঁজ নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়, তাহার পরিপূরণ হয়। গাভীর ও ছাগলের দুগ্ধ আমরা দোহন করিয়া লই, মেষ ও ছাগলের লোম কাটিয়া লই, কিন্তু ছাগল ও গাই আবার দুধ দেয়,—কর্ত্তিত-

লোম ছাগ ও মেষের গাত্রে, আবার বাড়িয়া উঠে। বুদ্ধিরুদ্ধ মানুষ বা অপর জীবজন্তু যদি ভুক্ত পদার্থের অজৈবাংশ একবারেই ধারণ করিয়া না রাখে, তাহা হইলে পরিত্যক্ত বা ক্ষয়প্রাপ্ত বা কর্ত্তিত জিনিসের স্থান আবার পরিপূরিত হইত না,—গাভীর স্তনে পুনরায় দুগ্ধ আসিত না। মানুষের নখ-চুল কর্ত্তিত না হইলেও, কিম্বা পশুর দুগ্ধ দোহিত না হইলেও, শরীরের স্বাভাবিক ক্ষয় আছে নখ বা চুল কর্ত্তিত না হইলেও স্বাভাবিক কারণে নখ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কেশ ও লোম আপনা হইতে খসিয়া পড়ে।

অতঃপর গর্ভবতী পশুতে যে পরিমাণ আহার করে, তজ্জাত বর্জ্জনা মধ্যেও অজৈব পদার্থের পরিমাণ, সে অনুপাতে কম থাকে, কারণ ভুক্ত পদার্থ দ্বারা গর্ভিণী নিজের শরীর রক্ষা করে এবং গর্ভস্থ বৎসের শরীর বর্দ্ধিত করে। সুতরাং অগর্ভিণী অপেক্ষা গর্ভিণীর সারে অনেক জিনিসের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প দেখা যায়। এই সকল কারণবশতঃ প্রাণীজবর্জ্জনায় গুণের তারতম্য হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, গোময় অপেক্ষা ঘোড়ানাদী অধিক সারবান। অশ্বের নাদী সমধিক পরিমাণে উষ্ণ, কারণ তন্মধ্যে নাইট্রোজেন সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান। কোন স্থানে অশ্বের নাদী সঞ্চিত থাকিলে তাহা হইতে উষ্ণ বাষ্প উত্থিত হয়,—ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সেই অবস্থায় উক্ত স্তূপ মধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তন্মধ্যস্থিত উত্তাপ বেশ উপলব্ধি হয়। গো-জাতির নাদীতে যে উত্তাপ জন্মে না তাহা নহে, তবে সে উত্তাপের তত তেজ থাকে না এবং সে উত্তাপও অধিক কাল ব্যাপ্ত নহে। এই কারণে ঘোড়ার নাদী উগ্র এবং গোবর মৃদু সার

মধ্যে পরিগণিত। অশ্বাবর্জ্জনায় জলের ভাগ অল্প থাকে, তাহার উপর নাইট্রোজেনের ভাগও অধিক অবস্থিত, কিন্তু গোময়েতে ঠিক তাহার বৈপরীত্য দেখা যায়। গোমায়ুতে সমধিক পরিমাণে জল থাকে, এবং গরুদিগের পরিপাক-শক্তি অধিক বলিয়া ঘোড়ার নাদী অপেক্ষা গোবরে অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব দেখা যায়। সুতরাং যে কোন প্রাণিজাত সার হউক, তাহার সংগঠন দেখিলেই অনেকটা বুঝিতে পারা যায় যে, কোন্ সার ভাল বা কোন্ সার মন্দ। মেষ ও ছাগের নাদী অশ্বের নাদী অপেক্ষাও নীরস ইহা সকলেই অবগত আছেন। তাহা ব্যতীত, ইহাদিগের নাদীতে উদ্ভিদবর্দ্ধনকারী ফস্ফরিক-য়্যাসিড ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ অধিক। এই হেতু, অশ্বনাদী অপেক্ষা মেষ ও ছাগলের নাদী অধিক সারবান এবং সহজেই উত্তপ্ত হইয়া উঠে। মেষ কিম্বা ছাগলের নাদীতে পোট্যাস নামক পদার্থের পরিমাণ অল্পই থাকে, কারণ তাহারা যে সকল সামগ্রী আহার করে তন্মধ্যস্থিত পট্যাস নামক পদার্থ তাহাদিগের লোম সংগঠনে নিয়োজিত হয়, কাজেই অধিক পট্যাস বর্জ্জন করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের নাই।

উদ্ভিজ্জীবনের হিতকল্পে নাইট্রোজেন ও ফস্ফরিক-য়্যাসিড বিশেষ প্রয়োজন, এবং সেই দুইটী পদার্থই মেষ ও ছাগলের নাদীতে সমধিক পরিমাণে বর্ত্তমান এবং এই জন্য গো ও অশ্ব-নাদী অপেক্ষা ইহাদিগের সার তেজস্কর। ওয়ারিংটন সাহেব বলেন যে, মেষের অধৌত লোমে এত অধিক পরিমাণে পট্যাস থাকে যে, ক্ষৌরিকৃত মেষের সমগ্র শরীরেও তাহা পাওয়া যায় না।

এতদ্দ্বারা কেহ যেন না বুঝেন যে, গোবর নিষ্প্রয়োজনীয় এবং ঘোড়ার বা মেষের নাদী মাত্র ব্যবহার্য্য। নাদীর মধ্যে সার

ভাগের ইতরবিশেষ থাকিলেও, জাতিবিশেষ পশুর নাদী সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। অশ্ব অপেক্ষা গোরু হইতে অধিক গোবর পাওয়া যায়, কিন্তু অশ্বনাদী অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, গোবর-সার তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে তাহা পাওয়া যায়। মেষ ও ছাগল নাদী সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযুজ্য। পশুদিগের বর্জ্জনা সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, কোন্ পশু কিরূপ আহার পাইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে পশু ভাল ও যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায় তাহার সারই সারবান পদার্থে পূর্ণ। একটী দল-চোরা ঘোড়া পথে-ঘাটে চরিয়া বেড়ায়, আর একটী গাভী গৃহস্থের সেবা পাইয়া থাকে অর্থাৎ পেট ভরিয়া খাইতে পায়, এবং যে সকল সামগ্রী ভোজন করিতে পায় তাহার অধিকাংশই পুষ্টিকর। এস্থলে দল-চোরা ঘোড়ার নাদী অপেক্ষা গৃহপালিত গাভীর গোবর যে সমধিক সারবান হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

যে কোন পশুর সারই ক্ষেত্রকার্য্যে ব্যবহৃত হউক না, সার সংগ্রহের পূর্ব্বে দেখা উচিত যে, উহা সুরক্ষিত পশুর সার কি না ? সুপালিত পশুর সার না হইলে, ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিতে হয়। খৈল, ভাল তৃণ, দ্বিদল-ভুষি, লবণ প্রভৃতি যে গোরু যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পায়, তাহার গোবরমধ্যে উল্লিখিত খাদ্যসামগ্রীস্থিত জৈবপদার্থ আসিবেই আসিবে, এবং তাহা হইলে উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধিকারী নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক-য়্যাসিড ও পট্যাস তাহার মধ্যে সমধিক পরিমাণে থাকিবে। উক্ত তিনটী পদার্থ যাহাতে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাই উত্তম নাদী বলিয়া মানিতে হইবে।

প্রাণিজ-সার বলিলে সাধারণতঃ প্রাণিগণের মল-মূত্রই বুঝাইয়া থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই। এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অশ্বশালা, গো-শালা, খোঁয়াড় প্রভৃতি স্থান হইতে প্রাণিজ-সার সাধারণতঃ সংগৃহীত হইয়া থাকে। উল্লিখিত দুইটী সামগ্রী গোয়াল-ঘর, আস্তাবল, হাতীশালা, খোঁয়াড় প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায় এবং সেই সামগ্রীর নাম—আবর্জ্জনা বা ওঁচলা। রাত্রিকালে পশুদিগের শয়নের জন্য তাহাদিগের গৃহ মধ্যে খড়, শুষ্ক তৃণ প্রভৃতি প্রসারিত করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত খড়-কুটিকেই এ স্থলে আবর্জ্জনা (litter) নামে অভিহিত করা হইতেছে। গৃহমধ্যে বিচালি প্রসারিত করিয়া দিলে পশুগণ তদুপরি শয়ন করিয়া আরাম লাভ করে। এতদ্ব্যতীত মল-মূত্র ত্যাগ করায় গৃহের মেজে (floor) তাদৃশ সিক্ত ও অপরিচ্ছন্ন হইতে পায় না। পরিত্যক্ত মল-মূত্র বিচালিতে শোষিত হইয়া যায়, ফলতঃ তাহা নষ্ট হইতে পায় না। এই সকল আবর্জ্জনা সার হিসাবে বড়ই মূল্যবান্ সামগ্রী এবং সেই জন্য পশুদিগের আবাস-স্থান মাত্রেই সকল সময় বিচালি প্রসারিত করিয়া রাখায় বিশেষ লাভ আছে কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিদিনই একই খড় প্রসারিত করিয়া দেওয়া উচিত নহে, কারণ একবারের ব্যবহৃত খড় পুনর্ব্বার বা বারম্বার ব্যবহার করিলে পশুগণ পীড়িত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এইজন্য কেবল যে ধান্যের খড় ব্যবহার করিতে হইবে তাহা নহে। ধান্য, গোধূম, যব, যই, মাড়ুয়া প্রভৃতির খড়ও ব্যবহার্য্য। তিসি, সর্ষপ প্রভৃতির ভূষিও এতদর্থে নিয়োজিত করিতে পারা

যায়। পশুদিগের গৃহ হইতে প্রতিদিন যে অল্পাধিক আবর্জ্জনা ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে কি উপকার পাওয়া যাইতে পারে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব।

যে সকল জিনিষের নামোল্লেখ করা গেল তৎসমুদায়েরই শোষণ করিবার শক্তি আছে। এই জন্য খড় বা ভূষি পশুদিগের আবাসে প্রসারিত থাকিলে এবং তদুপরি তাহাদিগের মলমূত্র পতিত হইলে, তদন্তর্গত রস বা জলীয় অংশ প্রসারিত আবর্জ্জনায় শোষিত হইয়া অবরুদ্ধ থাকে। এবম্প্রকারে শোষিত-আবর্জ্জনা কৃষি-কার্য্যোপলক্ষে বিশেষ উপযোগী। আবর্জ্জনা না থাকিলে পরিত্যক্ত পদার্থ—নাদী ও চোনাসম্ভূত জলীয়ভাগ নষ্ট হইয়া থাকে।

পরিত্যক্ত পদার্থদ্বয়—নাদী ও চোনা—স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষিত হইলেও সমভাবে সর্ব্বময় হইতে পারে না। এতদুভয়কে একত্র সংমিশ্রিত করিলেও কোন স্থলে অধিক, আবার কোন স্থলে অল্প মাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। তাহা ব্যতীত সংমিশ্রণ-হেতু সারের কোন অংশ তেজস্কর আবার কোন অংশ অল্প তেজস্কর হইয়া থাকে, কিন্তু আবর্জ্জনার উপরে পরিত্যক্ত পদার্থ পতিত হইলে, উহার জলীয় ভাগ বহুদূর ব্যাপিয়া পড়ে তন্নিবন্ধন উহার শক্তিও তন্মধ্যে অল্পাধিক বিস্তারিতভাবে অবস্থান করে। ঘন সারকে বিস্তারিত করিবার পক্ষে ইহা একটী বিশেষ উপায়।

আবর্জ্জনা দ্বারা সারের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইলে, বহু পরিমাণে সমভাবে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। স্থূলসার যতই সাবধানতা সহকারে প্রসারিত হউক না কেন, কোন স্থানে অধিক এবং কোন স্থানে অল্প পরিমাণে পতিত হইয়াই থাকে। সারপ্রদত্ত একই ক্ষেত্র মধ্যে কোন স্থানের

গাছ তেজস্কর, আবার কোন স্থানের গাছ ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র হইয়া থাকে, ইহা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রধান কারণ এই যে, সর্ব্বস্থানে সমপরিমাণে উহা পাতিত হয় না। জলীয় সার-সমন্বিত-খড় বা ভূষি সারের সহিত সংযুক্ত থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। সারের জলীয় অংশ আবর্জ্জনার সহিত মিশ্রিত থাকিলে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কেন যে তাহা হয়, এস্থলে তাহাই ব্যক্তব্য। খড়ের নিজ অবয়বে সার স্বভাবতঃ কিছু অবস্থিত। কেবল খড়ের বলি কেন, তাবৎ জৈব (Organic) পদার্থেই উদ্ভিদের ভরণপোষণোপযোগী সামগ্রী আছে সুতরাং খড় ও ভূষি সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় খড়ে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থের পরিমাণ মধ্যে ইতরবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ইহা মনে করা ভ্রম যে, সার হিসাবে ধান্য, গোধূম, যব, যই প্রভৃতি সকল জিনিসের খড় সম-সারপদার্থ-সমন্বিত।

অতঃপর জলীয় সারসম্পৃক্ত-খড় ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইলে অথবা সার-কুড়ে রক্ষিত হইলে বিচালির অন্তর্গত স্থূল বা অজৈব (Solid) ও বাষ্পীয় (gaseous) পদার্থের সংযোগে গোবর প্রভৃতি সারের মধ্যে সমাবেশফল-সম্ভূত-ক্রিয়ার (mechanical action) সমাধান হয় এবং সারের আবয়বিক (physical) গঠনের সংস্কার হয়। জল ও উত্তাপের সংযোগে বাষ্প (steam) উৎপন্ন হয় এবং এতদুভয়ের সংযোগে যে কার্য্য হয় তাহা ভৌতিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। জল ও অগ্নি সংযোগে জলের গুরুত্ব বিনষ্ট হয়। ইহাই জলের আবয়বিক সংস্কার বা পরিবর্ত্তন (Physical change)।

জলীয়-সার-শোষিত-বিচালি, গোময়াদি স্থূল সারের সহিত

একত্রে স্থান প্রাপ্ত হইলে, শেষোক্ত সারের দ্রবন কার্য্যের ক্ষিপ্রতা বিনষ্ট হয় এবং সুচারুরূপে বিগলিত হইবার পক্ষে সহায়তা করে। বিচালি অবিমিশ্র সার, স্বভাবতঃই শীঘ্র বিগলিত হইয়া যায়। যে সার যত শীঘ্র পচিয়া যায়, সে সারের সারভাগ তত শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। সার ধীরে ধীরে বিগলিত হইতে থাকিলে ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিদ তাহা ধীরে ধীরে আহরণ করিতে পারে। সার শীঘ্র পচিয়া গেলেই যে উদ্ভিদগণ তাহা ত্বরিতবেগে আহরণ করিয়া লইবে ইহা মনে করা বিষম ভ্রম। অনাহারে মানুষ সহজে মরে না, এবং প্রচুর আহার্য্য দিলেও নিজ প্রয়োজনাধিক খাদ্য আহার করে না বা করিতে পারে না। সেইরূপ উদ্ভিদগণও নিজ নিজ প্রয়োজনানুরূপ সার বা খাদ্য অল্প বা অধিক আহরণ করিয়া থাকে। অতিরিক্ত আহার্য্য প্রদান করিলে প্রয়োজনীয় ভাগের অতিরিক্তাংশ অপব্যয়িত হইয়া থাকে। অপ্রয়োজনীয়াংশ আপাততঃ উদ্ভিদগণ আহরণ না করিলেও যদি তাহা উহাদিগের মূলদেশে সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তাহা না হইয়া অতিরিক্তাংশের কিয়দ্ভাগ মৃত্তিকার নিম্নতম দেশে নামিয়া যায়, অপরাংশ বাষ্পাকারে আকাশে উড়িয়া যায়। এই কারণবশতঃ কোন গাছে বা কোন ক্ষেত্রে একবারে সমধিক পরিমাণে সার প্রদান করা উচিত নহে, ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক হইয়া থাকে। নিয়মিতকাল ব্যবধানে এবং উদ্ভিদগণের আহরণ-শক্তি বুঝিয়া সার প্রদান করিলে অল্প সারে অধিক ফল পাওয়া যায়। বিগলিত বা সহজে দ্রবনীয় সার ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে প্রদান করিলেও সেই-রূপ ফল হয়, অর্থাৎ উদ্ভিদগণ প্রদত্তসারের কিয়দংশও আহরণ

করিবার বহু পূর্ব্বেই সেই সার বিগলিত হইয়া গিয়া উল্লিখিত প্রকারে অপব্যয়িত হইয়া থাকে কিন্তু সার, খড় সম্বলিত হইলে, ধীরে ধীরে পচিতে থাকে, ফলতঃ উদ্ভিদগণও ক্রমশঃ সমুদায় সারাংশ আহরণ করিতে সমর্থ হয়।

পশুদিগের শয্যার জন্য অনেক স্থলেই বিচালি ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রধান কারণ এই যে, উহা সহজলভ্য। অতঃপর ইহাও দেখা যায় যে, উহার শোষণশক্তি সমধিক। এই সামগ্রী কৃষিজীবিমাত্রেরই একটী লাভের জিনিষ। পশু এবং পশুশালা হইতে আমরা যাহা কিছু পাইয়া থাকি, তাহা ব্যতীত গোয়ালের প্রতিদিনের 'কুড়' বা আবর্জ্জনা একটী অতিরিক্ত লাভ, কারণ ইহার জন্য কোন স্বতন্ত্র খরচ নাই কিম্বা স্বতন্ত্র পরিশ্রম নাই, সাররূপে বিচালির নিজস্ব বিশেষ মূল্য নাই। বিচালি সমধিক শোষণক্ষম, ফলতঃ পশুদিগের খোঁয়াড় বা গোয়ালে প্রসারিত থাকিলে পশুদিগের পরিত্যক্ত-পদার্থগত জলীয়ভাগ নষ্ট না হইয়া তাহাতে শোষিত হয়, এই জন্য আমরা ইহাকে এত প্রয়োজনীয় মনে করি। ধান্যের বিচালি পশুদিগের আবাসস্থানে প্রসারণের জন্য সকল সময়ে সুবিধা হয় না, তাহার কারণ এই যে, উক্ত বিচালি দ্বারা এ দেশে গো-মহিষাদি পশুদিগকে জীবনধারণ করিতে হয় এবং গৃহাদির ছাউনির জন্যও উহা বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দুই কারণবশতঃ ধান্যের বিচালি অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ, সুতরাং সাধারণ লোকে উহাকে পশুদিগের শয্যার জন্য ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না। গোধূম, যব, যই, মাড়ুয়া কঙ্গন বা কাঁওন প্রভৃতির খড় পশুদিগের আহারের জন্য অল্লাধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু গৃহাদির ছাউনি-কার্য্যে

আদৌ ব্যবহার নাই। এইজন্য ইহাদিগের খড় অনেক সুলভ সুতরাং সকলেই অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সাররূপে বিচালি তত মূল্যবান্ নহে, কারণ যে সকল বস্তু অধিক পরিমাণে থাকিলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়, বিচালিতে তাহা অল্পই থাকে। নাইট্রোজেন ও ফস্ফেট এই দুইটী পদার্থ উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু শুষ্ক বিচালিতে উক্ত দুইটী পদার্থেরই পরিমাণ অতি অল্প থাকে। ধান্যের গাছে শস্য দেখা দিবার পূর্ব্বে উহাতে উক্ত দুইটী পদার্থ সমধিক পরিমাণে অবস্থান করে, কিন্তু শস্যকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য উদ্ভিদান্তর্গত নাইট্রোজেন ও ফসফেট সমধিক ব্যয়িত হয় সুতরাং উক্ত পদার্থদ্বয়ের অধিকাংশই শস্যে গিয়া স্থান প্রাপ্ত হয় এবং শস্যের মধ্যেই থাকিয়া যায়। অন্যদিকে উদ্ভিদাংশে উক্ত পদার্থদ্বয়ের বহু পরিমাণে অভাব ঘটে। এই জন্য বিচালি অপেক্ষা শস্য অনেক পরিমাণে সারবান্ ও পুষ্টিকর। ধান্যের খড় অপেক্ষা ধান্য, যবের খড় অপেক্ষা যব, মাড়ুয়ার খড় অপেক্ষা মাড়ুয়া অধিক সারবান, কিন্তু ধান্য, যব প্রভৃতি শস্য মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থের তারতম্যে যেরূপ শস্যবিশেষের তারতম্য হইয়া থাকে, বিচালি সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। ধান্যের বিচালি অপেক্ষা গোধূমের বিচালি, গোধূমের বিচালি অপেক্ষা যইয়ের বিচালি, এবং যই-বিচালি অপেক্ষা যব-বিচালি পুষ্টিকর। পুষ্টিকারিতার প্রধান উপকরণ যবক্ষারজান (nitrogen) এবং সাধারণতঃ বিচালির মধ্যে উক্ত পদার্থের পরিমাণ শত অংশে অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ একশত মণ বিচালিতে অর্দ্ধমণ বা একমণ বিচালিতে ন্যূনধিক ৶৫ সওয়া-তিন-ছটাক মাত্র। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিচালির প্রকারভেদে উক্ত পরিমাণের

তারতম্য হইয়া থাকে। কেবল যে যবক্ষারজান সম্বন্ধে এইরূপ তাহা নহে। ফসফেট, চূণ, পটাস্ প্রভৃতি অপরাপর যে যে উপকরণ বিচালি মধ্যে থাকে, বিচালির প্রকারভেদে তাহাদিগের পরিমাণেরও তারতম্য হয়।

মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, শুষ্ক বিচালি মধ্যে শতকরা পাঁচ হইতে সাড়ে পাঁচভাগ ভস্ম পাওয়া যায়। এই ভস্মাংশ ফস্‌ফরিক-এসিড, পট্যাস ও অপরাপর অদাহ্য পদার্থের সমষ্টিমাত্র। বিশ্লেষণ করিলে ভস্ম হইতে চূণ, সোডা, পটাস, লৌহ, ম্যাগ্নেসিয়া, প্রভৃতি অনেক জিনিস পাওয়া যায় এবং তৎসমুদায়ই উদ্ভিদ্ শরীরে বিশেষ বিশেষ কার্য্য সংসাধিত করিয়া থাকে, তন্নিবন্ধন কোনটীই উপেক্ষণীয় নহে।

সারের জলীয় অংশ শোষণ করিবার পক্ষে বিচালি দ্বারা সহজে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় বলিয়া এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা গেল কিন্তু এতদ্দ্বারা এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিচালি ভিন্ন অপর কোন জিনিস নিয়োজিত হইতে পারে না। যে সকল জিনিসের শোষণ ও ধারণ করিয়া রাখিবার শক্তি আছে অথচ সহজপ্রাপ্য ও সুলভ, তৎসমুদায়ই শোষকরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। মৃত্তিকা, ছাই, ভূষি প্রভৃতিরও শোষণ শক্তি আছে, কিন্তু পশুগৃহে উহা প্রসারিত হইলে গৃহ মধ্যে কাদা হয়, ঘর সর্ব্বদা সিক্ত হইয়া থাকে, ঘর দুর্গন্ধময় হয়। এইরূপ আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া পশুগণ পীড়িত হইয়া পড়ে। মাটি, ছাই, ভূষি ও তদনুরূপ আবর্জ্জনা নাদী ও চোনার সংস্পর্শে কাদাটে হইয়া গেলে, সেই কাদা উত্তপ্ত হইতে বহু বিলম্ব হয় এবং তাহাতে যে উত্তাপ উৎপন্ন

হয়, তদ্দ্বারা তদন্তর্গত সার মধ্যে ভৌতিক ক্রিয়ার তাদৃশ সমাবেশ হয় না।

কোন জিনিসকে সিদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে যেরূপ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হয়, সেইরূপ সারকে পচাইতে হইলে ভৌতিক উত্তাপের অধীন করিতে হয়। যাহাতে যবক্ষারজানিক বা জৈব পদার্থ আছে তাহাতেই উত্তাপ জন্মিতে পারে কিন্তু সে পদার্থ যতক্ষণ শুষ্ক থাকে ততক্ষণ তাহাতে উত্তাপের সমাবেশ হয় না এবং অতিরিক্ত সিক্ত হইলেও তাহাতে শীঘ্র উত্তাপ উৎপন্ন হয় না। এক বস্তা চাউল বা গোধূমকে শুষ্কাবস্থায় বহুদিন রাখিতে পারা যায় কিন্তু তাহাকে ঈষৎ সিক্ত করিয়া দিলে দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই উহার ভিতরে উত্তাপ জন্মিবে এবং সেই উত্তাপের সাহায্যে বস্তার ভিতর সিক্ত চাউল বা গোধূম পচিতে থাকিবে, সুতরাং, সারের জলীয়াংশকে শোষিত করিবার জন্য মৃত্তিকা বড় সুবিধাজনক নহে। নিতান্ত-পক্ষে মৃত্তিকা ব্যবহার করিতে হইলে দো-আঁশ মাটি, তদপেক্ষা অধিক স্পৃহণীয়—বোদ মাটি। বেলে মাটি শোষণক্ষম বটে, কিন্তু ধারিকাশক্তিহীন বলিলেই হয়। অন্য দিকে, এটেল মাটির দানা অতিশয় সূক্ষ্ম এবং সে মাটি শুষ্কাবস্থায় কঠিন এবং শিক্তাবস্থায় চটচটে ও পিচ্ছিল, সুতরাং শোষণকার্যের জন্য বিশেষ উপযোগী নহে। কাঠের কয়লা, সারমধ্যস্থিত নাইট্রোজেন, এমোনিয়া ও অপরাপর গলনীয় পদার্থকে বিশেষরূপে ধারণ করিয়া রাখিতে সক্ষম। কোন পদার্থকে অতিশয় দগ্ধ করিলে তাহা হইতে নাইট্রোজেন বিমুক্তি লাভ করে, কিন্তু সেই বিদগ্ধ নাইট্রোজেন-বিবর্জ্জিত-পদার্থ অতি সহজেই বায়ুমণ্ডল হইতে বহু পরিমাণে য়্যামোনিয়া নামক বাষ্পীয় পদার্থ আহরণ করিতে সমর্থ। বিদগ্ধ উদ্ভিজ্জ-পদার্থ অর্থাৎ কয়লা

নিজ ওজন অপেক্ষা নিরানব্বই গুণ এমোনিয়া ধারণ করিতে পারে অর্থাৎ একপোয়া কয়লা অন্যূন ॥৪দ (চব্বিশ সের তিন পোয়া) এমোনিয়া ধারণ করিবার শক্তিধারণ করে, কিন্তু জলীয় বা সিক্ত সামগ্রী হইতে তত অধিক পরিমাণে উক্ত বাষ্প শোষণ করিতে সমর্থ হয় না, কারণ রস দ্বারা উহার ছিদ্রসমূহ বহুপরিমাণে পরিস্কৃত হইয়া যায়। সেই রসের মধ্যে যতটা এমোনিয়া থাকিতে পারে, তাহাই উহার মধ্যে স্থান পাইয়া থাকে।

কেবলই যে পশুশালায় বিছাইবার জন্য এই সকল সামগ্রীর উল্লেখ করা গেল তাহা নহে। সারের অন্তর্গত নাইট্রোজেন ও অপরাপর গলিত পদার্থ বাষ্পাকারে না উড়িয়া যায় কিম্বা জলীয় ভাগ ভূমিতে না শোষিত হইয়া যায়, এতদুদ্দেশ্যেই নানাবিধ শোষক ব্যবহার করিতে হয়। গোয়ালঘর ও খোঁয়াড়ে সাধারণতঃ সঙ্গতি অভাবে বিচালি বা তৃণ বিছাইয়া দেওয়া ঘটিয়া উঠে না। ঈদৃশ অবস্থায় অনেক গৃহস্থের পশুশালা মধ্যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ছাই ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং পরদিন গৃহ পরিষ্কার করিবার সময়ে তৎসমুদায় এবং পশুদিগের ভুক্তাবশিষ্ট খড়, তৃণ ও তরিতরকারির খোসা প্রভৃতি সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে বহিস্কৃত করা হয়। এতদ্দ্বারা গৃহের সিক্ততা ও দুষিত বায়ু দুর হয় এবং সেই সঙ্গে পশুদিগের মলমূত্রাদিও পরিস্কৃত হয়। উক্ত ছাই-সমন্বিত-গুঁচলা অতি মূল্যবান সার। কৃষিকার্য্যের জন্য এই সকল জঞ্জাল যেরূপ মূল্যবান্ পদার্থ, লোকে কিন্তু তৎপ্রতি সেরূপ আস্থা প্রদর্শন করে না এবং সেই জন্যই তাহার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বা আদৌ যত্ন নাই। জঞ্জালই বটে, কিন্তু যাহা হইতে উপকার পাওয়া যায় তাহার একটা মূল্য আছেই, সুতরাং জঞ্জালেরও মূল্য আছে।

যে জঞ্জাল হইতে যত অধিক পরিমাণে উপকার পাওয়া যায়, তাহার মূল্য তত অধিক। অনেকে সারের জন্য লালায়িত, পয়সা দিয়াও ক্রয় করিতে পায় না, কিন্তু প্রতিদিন কত রাশি রাশি সারবান্ জঞ্জাল অপব্যয়িত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয় ? এই সকল জঞ্জালকে ফেলিয়া না দিয়া গৃহস্থগণ যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী হৌজ বা মন্নাই নির্ম্মাণ করতঃ তন্মধ্যে প্রতিদিন রক্ষা করেন এবং প্রয়োজনমত নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন তাহা হইলে কত লাভের বিষয় হয়। নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, প্রতিদিনের সংগৃহীত জঞ্জালকে দুই চারিমাস অন্তর অপর কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিলেও কিছু অর্থাগম হইতে পারে। ওঁচলা-আবর্জ্জনা বাসস্থানের সন্নিকটে পতিত থাকিলে ক্রমশঃ পচিয়া স্থানীয় আবহাওয়া দূষিত করে, তন্নিবন্ধন নিকটস্থিত অধিবাসীগণ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জঞ্জালরাশিকে উল্লিখিত উপায়ে সংগৃহীত ও স্থানান্তরিত করিতে পারিলে আর্থিক ও দৈহিক—উভয়বিধ লাভ অতি সহজেই করিতে পারা যায়। পল্লী-গ্রামে জ্বালানী-কাষ্ঠের মহার্ঘ্যতাবশতঃ বহু লোকে অশ্ব, গো, মহিষ, ছাগ, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর নাদের সাহায্যে রন্ধনাদি কার্য্য সমাধা করে, কিন্তু তজ্জাত ছাই ও অপরাপর ওঁচলা সাহায্যে পশু-দিগের মূত্র ধরিয়া রাখিতে পারিলে সারের অনেক অভাব দূর হইতে পারে। কৃষক উদ্যোগী হইলে একটী গোরু ও একখানি শকট রাখিয়া তাহার সাহায্যে সময়ে সময়ে গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ী হইতে আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিতে পারেন। উক্ত প্রস্তাব মধ্যে অসম্ভব বা অঘটনীয় কিছু নাই। এই প্রণালীতে গ্রন্থকার বারোমাস প্রতিদিন গ্রামের সকলের বাড়ী হইতে আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিতেন।

জলীয়-সারের শোষকরূপে বোদমাটি (Peat) ব্যবহৃত হইতে পারে, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। বোদ মাটি অতি লঘু পদার্থ এবং শুষ্কাবস্থায় জলে ভাসিয়া থাকে, অগ্নিসংযোগে প্রজ্বলিত হয়। ইহার শোষণশক্তি ও ধারণশক্তি বিচালি অপেক্ষা অনেক অধিক। এতদ্ব্যতীত বোদ মাটি নিজেই সোরাজানপূর্ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিচালিতে শতকরা অর্দ্ধভাগ, কখন কখন এক ভাগ পর্য্যন্ত সোরাজান থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু বোদ-মাটিতে সোরাজানের ভাগ এত অধিক যে, তাহাতে চারি হইতে পাঁচ ভাগ থাকা বিরল নহে। যে স্থানে বোদ-মাটি সহজ প্রাপ্য, তথায় উহাকে কোন মতে উপেক্ষা করা উচিত নহে। প্রাণিজ সারের সহিত উহা সম্মিলিত না হইতে পারিলেও, কেবল উহারই সাহায্যে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধন করিতে পারা যায়। প্রায় আঠার কি উনিশ বৎসর হইল কলিকাতা কাশিপুর হর্টিকলচার্ল ইনষ্টিটিউশনের উল্টাডিঙ্গিস্থিত সুবৃহৎ উদ্যানে পুষ্করিণী খননকালে উক্ত বোদ বা পাণ্ডবপোড়া মাটির একটী সুগভীর স্তর পাওয়া যায়। গ্রন্থকার তখন উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক থাকায়, তিনি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু কৃষিবিশারদ মহাশয়কে উহা দেখাইবার জন্য লইয়া যান। গিরিশবাবু উহা দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দেন যে, উহা বোদ মাটি বা পাণ্ডবপোড়া মাটি। তদবধি আমরা সেই মাটি বহুদিন ধরিয়া বহু কার্য্যে ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। খনিমধ্যে পাথুরে কয়লার যেরূপ স্তর দেখা যায়, মৃত্তিকা-গর্ভে বোদ মাটিরও সেইরূপ স্তর কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়। কাটিয়া তুলিবার পর শুষ্ক হইয়া গেলে উহাকে সহসা

পাথুরে কয়লার চাপ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু লঘু না হইলে কেহই উহাকে পাথুরে কয়লা ভিন্ন আর কিছু বলিত না। প্রকৃত পক্ষে ইহাই আরও কিছু কাল ভূগর্ভে থাকিলে পাথুরে কয়লায় পরিণত হইয়া থাকে। বোদ মাটি কেন এত সোরাজান সঙ্কুল তাহা বলিয়া রাখিতেছি। যে সকল খাল, জলা বা বিল মধ্যে শেওলা, শর, শুশনী, কল্মী, হিংচে প্রভৃতি শাক কিম্বা পানা, হোগলা, পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি উদ্ভিদ বহুকাল হইতে জন্মিয়া আসিতেছে, মরিতেছে, আবার জন্মিতেছে, সেই সকলের প্রতি বৎসরের বিগলিত অংশ সেই জলাশয় মধ্যেই স্থান প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ জলাশয়সমূহ ভরাট হইয়া উঠে এবং কালক্রমে উহা ভরাট জমিতে পরিণত হয়। তখন সে জমি বসবাসের বা ক্ষেত-পাথারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া সেই ভরাট ভূমির গর্ভস্থিত উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট পদার্থ চাপ বাঁধিয়া বোদ মাটিতে পরিণত হয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়াও ক্রমশঃ স্তরে স্তরে উচ্চ হইয়া উঠায় তদন্তর্গত সোরাজান ও অপরাপর গলনীয় জৈব ও অজৈব পদার্থ ঘনরূপে উহারই মধ্যে থাকিয়া যায়। এই কারণবশতঃই বোদ মাটি এত মূল্যবান্ সামগ্রী।

বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্রসমূহও রসধারণক্ষম কিন্তু তাহাতে পটাস্ (ক্ষারজান,) ফস্ফরিক অম্ল ও সোরাজানের পরিমাণ বড়ই অল্প থাকে। তাহার কারণ এই যে, পত্র সকল যত পরিপক্ক হয়, ততই তাহাতে উক্ত পদার্থ সকলের অভাব হয়, সুতরাং পত্রগণের আর উদ্ভিদ শরীরে সংযুক্ত থাকিবার শক্তি থাকে না। ঋতুবিশেষে উদ্ভিদ শরীরের রস ঘন হয় এবং সঙ্কোচভাব ধারণ করিয়া উদ্ভিদের কাণ্ড ও শাখা প্রশাখাতে গিয়া আশ্রয় লয়। পত্র

হইতে রস যথন উদ্ভিদ-শরীরে গিয়া সঞ্চিত হয়, তখন পত্রান্তর্গত সোরাজান প্রভৃতি পদার্থও তৎসহ উদ্ভিদে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কোন একটী সজীব পত্রকে উদ্ভিদ হইতে স্খলিত করিয়া লইলে তাহাতে উক্ত পদার্থসমূহের কোন অভাব দৃষ্ট হয় না, কিন্তু আপনা হইতে যে পত্র বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহাতেই সে অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য উদ্ভিদস্থ পত্রমধ্যে যত সার পদার্থ থাকে, পতনোন্মুখ বা পতিত পত্রে তদপেক্ষা বহু পরিমাণে অল্প থাকে। এ সম্বন্ধে আর একটী সহজ প্রমাণ যে, যে পশু কাঁচা তৃণাদি ভক্ষণ করে তাহার শরীর যেরূপ পুষ্ট হয়, শুষ্ক তৃণ বা বিচালি ভক্ষিত পশুর সেরূপ হয় না।

যাহা হউক, রসা সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবার জন্য গাছের পাতা তত ভাল উপকরণ নহে। প্রথমতঃ উহাতে উদ্ভিদের পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য কিংবা নাই বলিলেই চলিতে পারে। অতঃপর যে সারের সহিত গাছের পাতা নিয়োজিত হয়, তাহা পচিতে বহু বিলম্ব হয়।

বাগান-বাগিচায় ব্যবহারের জন্য যাঁহারা পাতা-সার (leaf mould) প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, পাতার স্তূপ পচিয়া ব্যবহারোপযোগী হইতে অধিক দিন সময় লাগে কিন্তু তদপেক্ষা কত অল্পদিন মধ্যে গবাদি পশুর নাদী, খইল প্রভৃতি পচিয়া যায়!

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

মৃত্তিকার অজীর্ণরোগ।*

কৃষি ও ঔদ্যানিক কার্য্যে মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জন্যই কৃষক বা উদ্যানস্বামীকে মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকৃতি এবং পৃথক কার্য্য প্রভৃতি স্থির করিয়া লইয়া, তদনুযায়ী কৃষিকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। কেবল এক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিলে সকল সময়ে বা সকল স্থলে সম্ভাবিত ফল পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, অনেক সময় ব্যর্থমনোরথই হইতে হয়। একমাত্র উদ্ভিদের কিম্বা একমাত্র মৃত্তিকার রীতি-প্রকৃতির বিষয় বিবেচনা করিলে চলে না। মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ—ইহাদের বিষয় যুগপৎ চিন্তা করাই কর্ত্তব্য। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অনেক সময়ই সাফল্য-লাভ ঘটে না। ইচ্ছা করিয়াই যে কেহ ইহার ব্যতিক্রম ঘটায়, তাহা নহে। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাবই ইহার মুখ্যকারণ। শুধু দেখিয়া শুনিয়া অথবা বই পড়িয়া সকল তথ্য স্থির করিতে পারা যায় না। তবে সূক্ষ্ম দর্শন কিম্বা অধ্যয়ন দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে অনেক প্রকার সাহায্য পাওয়া যায়। কার্য্যক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের আবশ্যকতা কি?—সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি।

কথাটা একটু বিস্তৃতভাবেই বলিতেছি। গ্রন্থপাঠে কোন

---

* গ্রন্থকার লিখিত এই প্রবন্ধটী ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'কৃষি-সম্বন্ধ' পত্রিকায় ৩য় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রকার সারের গুণ অবগত হইলাম এবং প্রতিবেশীকেও তাহার ক্ষেত্রে সেই সার ব্যবহার করাতে সুফল লাভ করিতে দেখিলাম। ইহা হইতেই, সেই সার ব্যবহারে সর্ব্বত্রই যে সাফল্য লাভ ঘটিবে, এরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ, একই সার সকল স্থানে অথবা সকল প্রকার মৃত্তিকাতে সমভাবে কার্য্যকরী হয় না, হইতেও পারে না। এই জন্যই মৃত্তিকার বর্ত্তমান অবস্থা এবং মৃত্তিকার প্রাকৃতিক উপাদান ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া প্রত্যেক কৃষিকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিরই বিশেষ প্রয়োজন। অনেকেই গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ বা কোন প্রকার পক্ষী অথবা মৎস্য পুষিয়া থাকেন। যিনি যে জীবটী পালেন, সেই আশ্রিত জীবটীর কি অভাব, কোন্ কোন্ জিনিস সে পান ও আহার করিতে ভালবাসে, কোন্ জিনিস খাইলে সে পীড়িত হইতে পারে, কিরূপ স্থানে থাকিলে তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহাকে কি খাইতে দেওয়া কিম্বা কোন্ ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা তিনি অবগত আছেন। কিন্তু বৃক্ষাদির সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। এদেশে সাধারণতঃ কৃষক অথবা উদ্যানস্বামী বৃক্ষের প্রকৃতি জানিতে কোনরূপ চেষ্টাই করেন না, বিশেষতঃ মৃত্তিকা-তত্ত্ব বা মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিজ্জীবনের কি সম্বন্ধ, তাহাও অনেকে অবগত নহেন।

মনুষ্যেতর প্রাণীদিগের খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবার প্রকৃতিগত শক্তি আছে। মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু মানুষের সে স্বাভাবিক শক্তি নাই। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে মানুষ এই জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে। মানুষের সহিত অপরাপর জীবের এই স্থলেই প্রভেদ রহিয়াছে। মানুষের সহিত পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর-

জীবের বহু বিষয়েই সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই স্থলেই যেন প্রভেদের সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে অথবা সমগ্র জীবজগত যেন এক স্থূলকাণ্ড লইয়া কিয়দ্দূর উঠিয়াই, এই স্থলে বিভিন্নদিকে শাখা বিস্তার করিয়াছে। যাহা হউক, পশুপক্ষীরা স্বীয় অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করিতে না পারিলেও আমরা,—আমাদিগের অভাব বা সুখ-দুঃখের তুলনায়,—তাহাদিগের অভাব ও সুখ-দুঃখ বুঝিতে পারি, সুতরাং তাহাদের সুখদুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকি, পক্ষান্তরে, আশ্রিত জীবকে সাধ্যানুরূপ আরামে রাখিতেও সমর্থ হই। আমরা উদ্যান, অঙ্গিনা, ছাদ-বারাণ্ডা প্রভৃতি সুসজ্জিত করিবার জন্য কিম্বা ফল-ফুল আহরণের উদ্দেশ্যে, নানা জাতীয় উদ্ভিদ পুষিয়া থাকি, কিন্তু পশুপক্ষীপালনের জন্য আমরা যেরূপ যত্ন ও যেরূপ পরিশ্রম করি এবং যে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া থাকি, তদনুপাতে, উদ্ভিদের জন্য আমরা কি করি? বাগানের রাশি রাশি ফল কিম্বা তরি-তরকারী সংগ্রহ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করি; ক্ষেত্র হইতে অপরিমিত শস্য আহরণ করিয়া গোলা-মরাই বোঝাই করি, দেশবিদেশে তাহা চালান দিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করি, কিন্তু সেই সকল আনন্দদায়ী অথবা অর্থকরী উদ্ভিদের সহিত আমাদিগের সে সৌহৃদ্য, সে সহানুভূতি বা সে সমবেদনা কই? গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগের সহিত প্রভু ও তৎসম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের একটা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। পশু হউক বা পক্ষী হউক, সে পীড়িত হইলে, প্রতিপালক হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করে এবং পালিত জীবটী মরিয়া গেলে প্রতিপালকের প্রাণে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ জন্মে, এমন কি, এরূপ ক্ষেত্রে অনেককে রোদন করিতেও দেখা

যায়। ইহা স্বাভাবিক, কারণ, যত ঘনিষ্ঠতা তত বেদনা,—যত বেদনা তত বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা। নিতান্ত সখের, নিতান্ত উপকারী বা নিতান্ত অর্থকরী একটী উদ্ভিদ পীড়িত হইলে কিম্বা প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করিলে, কেহ কখনও, তাদৃশ ব্যথা-বেদনা না হউক, কিঞ্চিন্মাত্রও বেদনা অনুভব করিয়াছেন কি? যদিও কিছু ক্লেশ হয়, তাহার কারণ কি? হয় তাহার সুন্দর গঠন-পারিপাট্য, ফল-ফুলের শোভা বা সৌরভ, না হয় তাহা হইতে যে উপকার পাওয়া যাইত কিম্বা পাইবার প্রত্যাশা ছিল, তাহা বিনষ্ট হইল বলিয়াই, দুঃখ জন্মিতে পারে। ইহার মধ্যে আন্তরিকতা কিছুই নাই, ইহা ব্যবসাদারী দুঃখ। যাহা হউক, পোষা গাভী বা পোষা পাখী প্রভৃতির সহিত মানুষের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা ও মমতা, সহৃদয়তা সংস্থাপিত হওয়াও তদনুরূপ স্পৃহনীয়। গৃহপালিত পশু-পক্ষীদিগের পানাহার ও বাসস্থান প্রভৃতির বিষয়ে যেরূপ আমরা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখি, উদ্ভিদ-সম্পর্কে সেইরূপ নিরন্তর লক্ষ্য রাখিতে অভ্যস্থ হইলে, ক্রমে আমরা তাহাদিগকে ভালবাসিতেও শিখিব, ইহাদের অভাব, সুখসচ্ছন্দতা প্রভৃতি উপলব্ধি করিতেও সমর্থ হইব। ইহাই হইল—সূক্ষ্মদৃষ্টি। আমরা যতই সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিতে পারিব, উদ্ভিদের সুখ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদিগের ততই অন্তর্দৃষ্টি জন্মিবে এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে কোন বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে কিম্বা সে তত্ত্বের গূঢ়ত্ব-নির্ণয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারা যায় না। এই জন্য, উদ্ভিজ্জীবনের গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে হইলে অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ আবশ্যক। সৃষ্টিবিষয়ে মনুষ্য, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ—সকলেরই মধ্যে বহু সৌসাদৃশ্য আছে। নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে

এবং উদ্ভিদ বা পশু-পক্ষীদিগের জীবনগতির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আমরা ক্ষেত্রে সার প্রদান করিয়া থাকি এবং যত প্রকার সার আছে তন্মধ্যে খৈলকে উত্তম ও আশু উপকারী মনে করিয়া, তাহাই ব্যবহার করি। কিন্তু, বিভিন্ন প্রকার খৈলের মধ্যে গুণাগুণের যে তারতম্য আছে তাহা কয়জন ভাবিয়া দেখেন বা তদনুসারে কাজ করেন? সর্ষপ, তিল, তিসি, এরণ্ড, মাটকলাই (চীনাবাদাম), নারিকেল, কার্পাস-বীজ, সরগুঁজা প্রভৃতি নানাপ্রকার তৈলপ্রদ শস্য-বীজ নিষ্পেষিত করিয়া তদন্তর্গত তৈল বাহির করিয়া লইলে, যাহা অবশিষ্ট রহে, তৎসমুদয়ই পিষ্টক মধ্যে পরিগণিত হয়; তাহাই সাররূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইহাদের উপাদানভেদে গুণেরও তারতম্য হয়। তদ্ভিন্ন, শস্য বা বীজ যতই নিষ্পীড়িত করা হউক না কেন, খৈলের মধ্যে অল্পাধিক তৈলাংশ থাকিয়াই যায়। সাধারণ কৃষক লক্ষ্য করে না যে, কোন্ প্রকার খৈলে কত ভাগ তৈল বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্যই, খৈলসার ব্যবহার করিলেও, সকল ক্ষেত্রে সমভাবে সারের কার্য্য উপলব্ধি হয় না। তৈলপ্রদ শস্যের বীজ মধ্যে যে জৈব ও অজৈব উপাদানের ইতরবিশেষ আছে, আপাততঃ সে বিষয়ে কিছু বলিতে চাহি না। কিন্তু, যে খৈলের মধ্যে তৈলাংশ যত অধিক থাকে, তাহা ততই—সার হিসাবে—নিকৃষ্ট হয়, ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। খৈলে অধিক পরিমাণে তৈল থাকিলে, তৈলাংশের আধিক্যহেতু, তাহা জীর্ণ ও বিগলিত হইতে অধিক সময়ের আবশ্যক হয়। কারণ, তৈলের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম,—রক্ষা করা, ধ্বংস করা নহে। চাটনী, আচার

প্রভৃতিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করিবার জন্য সমধিক তৈলে ডুবাইয়া রাখিতে না পারিলে, ফলগুলি যে দুই চারিদিনের মধ্যেই পচিতে আরম্ভ করে, তাহা গৃহস্থমাত্রেই অবগত আছেন। পর-দিনের জন্য রাখিতে হইলে, গৃহস্থেরা অনেক সময়, মৎস্য-মাংসাদি যাহাতে পচিয়া না যায়, তন্নিমিত্ত তৈলপক্ক করিয়া রাখিয়া দেন। ইচ্ছা করিলে, তৈলসিক্ত করিয়াও, ইহা বহুদিন রাখিতে পারা যায়। এতদ্দারা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে,তৈলের একটা রক্ষণ-শক্তি আছে এবং সেই হেতু তৈলাক্ত কোন সামগ্রী শীঘ্র পচিয়া যায় না। তৈলাক্ত কোন পদার্থে জল, বায়ু বা উত্তাপ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এই তিনটী পদার্থ সমাবিষ্ট হইতে না পারিলে, কোন সামগ্রীই বিগলিত হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য। এই কারণেই তৈলযুক্ত খৈল বিগলিত হইতে বিলম্ব ঘটে। অতঃপর, ইহাও দেখা যায় যে, কালবিলম্বহেতু খৈল হইতে ক্রমশঃ তৈল নির্গত হইয়া গেলে, সেই তৈল ক্ষেত্রস্থ মাটিতে গিয়া স্থান পায়। এতদবস্থায়, খৈল লঘু হইয়া যায় বটে, কিন্তু তৈল একেবারে তিরোহিত না হইয়া মাটিতে সঞ্চিত থাকে। মাটিতে তৈল সঞ্চিত হইলে ক্ষেত্র রোগগ্রস্ত হয়। মৃত্তিকার রোগ হয়,—একথা শুনিয়া অনেকেরই হাস্যোদ্রেক হইতে পারে কিন্তু কথাটী উপেক্ষার নহে—ভাবিবার বিষয়।

মৃত্তিকার রোগ-সম্পর্কে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, রোগ জিনিষটা কি? স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রমজনিত অবস্থাকে রোগ বলিলে অসঙ্গত হয় না, বরং ইহা কতকটা সমীচীন বলিয়াই মনে হয়, সুতরাং মানুষ বল বা অপর জীববস্তু বল কিম্বা গাছ-পালা বল, স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও স্খলিত হইলে,

তাহারা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে রোগী বা রুগ্ন বলা যাইতে পারে। তৈল গ্রহণ করা ভূমির প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নহে; তৈল-গ্রহণকে মৃত্তিকার বিকার বলা যায়। তৈলসংযুক্ত হইলে মৃত্তিকার প্রকৃতি অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে, মৃত্তিকার প্রাকৃতিক ধর্ম্ম—উদ্ভিদপালনকার্য্য—স্থগিত রহে। ইহাকেই মৃত্তিকার রোগ বলা যায়। এক্ষণ দেখা যাউক, তৈল সংযোগে মৃত্তিকার কি রোগ হয়?

ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তৈল রক্ষণকারী—জীর্ণকারী পদার্থ নহে। খৈলজসারই হউক বা অস্থি, চর্ম্ম, নখ হইতে চুল উদ্ভূত তৈলসম্পন্ন চর্ব্বি বা তজ্জাতীয় কোন পদার্থ হউক, ভূমিসম্পৃক্ত হইলে, তাহাতে মৃত্তিকান্তর্গত জৈব ও অজৈব নির্ব্বিশেষে তাবৎ পদার্থেরই জীর্ণ হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। অজীর্ণপদার্থ উদ্ভিদ আহরণ করিতে পারে না। জলবত্তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যদি কোনরূপে উদ্ভিদ-শরীরে তৈল প্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে উদ্ভিদ পীড়িত হয়। এ স্থলে, অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, উদ্ভিদের শরীরে তৈল প্রবিষ্ট হইলেই যদি উদ্ভিদের পীড়া হয়, তাহা হইলে তিসি, তিল, চীনাবাদাম নারিকেল—অধিক কি, ক্ষুদ্রাকৃতি সর্ষপেই বা কোথা হইতে তৈলের সঞ্চার হয়? ইহার উত্তর এক কথায় না দিয়া, একটু বিস্তৃতভাবেই কয়েকটী কথা বলিতেছি। ভূমি হইতে মূল বা শিকড়ের সাহায্যে উদ্ভিদ যাহা আহরণ করে, তাহা খাদ্যমিশ্রিত পানীয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই খাদ্যমিশ্রিত পানীয় দ্বারা উদ্ভিদের কাঠাম (skeleton) অর্থাৎ কাষ্ঠের অংশ, মূল, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, পত্র, ফুলফলও বীজ—

অধিক কি, পত্রাদির শিরা পর্য্যন্ত গঠিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, মৃত্তিকান্তর্গত পদার্থ হইতে উদ্ভিদের কাঠাম মাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের মূল হইতে পত্র পর্য্যন্ত যে রসস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা পত্রে পরিপাক হইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন উদ্ভিদ্দেহের গঠন-কার্য্য সম্পাদিত হয়। এতদ্ব্যতীত, উদ্ভিদের অাবং পদার্থ অর্থাৎ শর্করা (Sugar), শ্বেতসার (Starch) ও লালা (albuminoides) প্রভৃতি, বায়বীয় পদার্থ ও সূর্য্যোকিরণসহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা হইতে চিনি গ্রহণ না করিলেও, প্রক্রিয়াবিশেষের সাহায্যে যেমন ফলাদিতে মধুর (মিষ্ট) রস বা চিনির অভাব ঘটে না, তদ্রূপ, শস্যেরও তৈলসঞ্চয়ের জন্য মৃত্তিকা হইতে তৈল গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

একমাত্র তৈলসম্পৃক্ত সার হইতে মৃত্তিকার যে অম্ল বা অজীর্ণ রোগের আবির্ভাব হয়, তাহা নহে। পুনঃ পুনঃ ও বহু পরিমাণ উদ্ভিজ্জ বা জৈব পদার্থ ক্ষেত্রে প্রদত্ত হইলেও মৃত্তিকায় অম্ল সঞ্চিত হয়। মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থের (Vegetable matters) অভাব ঘটিলে ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ, সার প্রদান করিয়া সে অভাব দূর করিতে হয় কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলে তাহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। ক্ষেত্র অম্লরোগাক্রান্ত হইলে তজ্জাত উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। এই জন্যই, যাহাতে মৃত্তিকার অম্ল বা অজীর্ণরোগ জন্মিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগ জন্মিলে, তাহার চিকিৎসাবিধান করা অপেক্ষা আদৌ রোগ জন্মিতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য। মৃত্তিকার অম্লরোগ জন্মিলে অর্থাৎ মৃত্তিকায় অম্ল সঞ্চিত হইয়াছে এরূপ অনুভূত হইলে, তাহাতে বায়ুসম্পৃক্ত হীনতেজ

চূণ প্রদান করিতে হয়। চূণই মৃত্তিকার অম্ল বা অজীর্ণ রোগের মহৌষধ। ক্ষেত্রে চূণ ব্যবহার করিলে মৃত্তিকার অম্লদোষ দূর হয়। পক্ষান্তরে, কোন জমিতে দৈবক্রমে অধিক চূণ প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, অবিলম্বে তাহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে কোন প্রকার থৈলচূর্ণ প্রদান করিতে হয়। অত্যধিক চূণযুক্ত মৃত্তিকার সহিত থৈলচূর্ণ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিলে, চূণের অনিষ্টকারিতা প্রায় সর্ব্বাংশেই হ্রাস পাইয়া থাকে।

—০—

চূণ সার।

চূণ সার।—সাংসারিক নানা কার্য্যে নানা প্রকারে চূণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জমির সংস্কার করিতে, মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে, মৃত্তিকাকে ফসল-বিশেষের উপযোগী করিতে এবং সাররূপে নানা উদ্ভিদের জন্য ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার উৎপত্তি, গুণাগুণ, এবং মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ-শরীরে ইহার কার্য্যাকার্য্য ইত্যাদি অবগত থাকিলে কৃষিকার্য্যে কিরূপে উহার ব্যবহার হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারা যায়। চূণের যেমন নানাবিধ গুণ আছে, তেমনই স্থল-বিশেষে ইহাদ্বারা সমূহ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ক্ষেত্রের অবস্থা, মাটির প্রকৃতি ও উপকরণ এবং প্রস্তাবিত ফসলের প্রয়োজন প্রভৃতি অনেক বিষয় বিবেচনা করিয়া তবে উহা ব্যবহার করা উচিত। মৃত্তিকার প্রকৃতি জ্ঞাত না হইয়া এবং ফসলের প্রয়োজন প্রভৃতির পরিচয় পরিজ্ঞাত না হইয়া, ক্ষেত্রনির্ব্বিশেষে চূণ ব্যবহার করিলে কোন স্থলে উপকার কোন স্থলে ক্ষতি হয়। এই

কারণে চূণের ব্যবহারে অনেকে সুফল প্রাপ্ত হয়েন, আবার অনেকে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন ফলাফলের জন্য চূণকে কোনরূপে দোষ দেওয়া যায় না, ইহা ব্যবহারকারীর বিবেচনা ও বিচক্ষণতার অভাবেই ঘটে।

উদ্ভিদ্দিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে প্রায় অল্লাধিক পরিমাণে চূণের অস্তিত্ব দেখা যায়। উদ্ভিদে যে সকল মৌলিক পদার্থ থাকিতে দেখা যায়, তৎসমুদায় মৃত্তিকা হইতেই আহরিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা উহাদিগের অস্তিত্ব ভাসা চক্ষে দেখিতে পাইনা। উহা মৃত্তিকার সহিত অতি সূক্ষ্মভাবে মিশ্রিত থাকে। মৃত্তিকায় চূণের অভাব থাকিলে তাহাতে সুচারুরূপে উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না, কিম্বা জন্মিলেও তেমন সবল ও পরিপুষ্ট হয় না। চূণ, মৃত্তিকামধ্যে—সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ—দুইভাবে কার্য্য করে। প্রথমতঃ উহার দ্বারা মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়;—এঁটেল মাটিকে যেমন উহা আলগা রাখে, বেলে-মাটিকে আবার তেমনই ঘনভাবে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু এতদুভয় প্রকার মৃত্তিকায় যদি চূণের একবারে অভাব থাকে, অথবা উহাদিগের ভিতর হইতে চূণের অংশ বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এঁটেল মাটির আর বায়ুমণ্ডল হইতে রস বা বাষ্পীয় পদার্থ গ্রহণের শক্তি থাকিবে না, জলশোষণেরও শক্তি থাকিবে না। অন্যদিকে, চূণ-বিবর্জ্জিত হইলে বেলে মাটির ধারকতা (Power of retention) একবারে কমিয়া যায়, এবং বালির মৌলিক অবস্থার যেমন আলগা ভাব ছিল, তাহাই থাকিয়া যায়।

চূণের অস্তিত্ব যে কেবল মৃত্তিকামধ্যে দেখা যায়, তাহা নহে;

মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীবদেহে চূণের একটা বিশেষ অংশ আছে। মনুষ্য-পশু-পক্ষীর অস্থি, মৎস্যাদি জলজন্তুর কাঁটা, শামুক-গুগলির আবরণ-এ সকলের মধ্যে অল্পাধিক চূণ আছে। ইহার মূল কারণ, মৃত্তিকা মধ্যে চূণের অস্তিত্ব। মৃত্তিকা-মধ্যে চূণের অস্তিত্ব-হেতু উদ্ভিদ্‌গণ উহা আহরণ করে এবং সেই সকল উদ্ভিদ বা তৎপ্রসূত ফল বা ফসল বা শস্য জীবগণ উদরস্থ করে বলিয়া তন্মধ্যস্থ চূণের কতক ভাগ জীবশরীরে গিয়া স্থান পায়। মৃত্তিকামধ্যে চূণ আছে বলিয়া সকল জলাশয়ের জলেও চূণের অংশ আছে, সুতরাং তাহাতে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে, তাহাতেও চূণ থাকিবে এবং যে সকল জলচর প্রাণী জলে বিচরণ করে এবং জলাশয়স্থিত গুল্মলতাদি আহার করে ও সেই জল পান করিয়া থাকে, তাহারাও জল হইতে শরীর মধ্যে চূণ গ্রহণ করে।

ক্যাল্‌সিয়ম (Calcium) নামক ধাতব পদার্থের সহিত অম্লজান (Oxygen) সংযুক্ত যে Oxide of calcium, তাহাই চূণের ধাতবীয় উপাদান। প্রস্তরকে যখন প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, তখন উহার ভিতরের রস ও গ্যাস (কার্ব্বণ ডাইওক্‌সাইড্) বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। কিন্তু যে-ই আবার তাহাতে জল দেওয়া যায়, অমনি সেই দগ্ধ প্রস্তররাশি জলশোষণ করিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে বায়ুমণ্ডল হইতে যত কার্ব্বনিক-এসিড্ আহরণ করিতে থাকে, ততই বিদীর্ণ ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। গৃহাদি নির্ম্মাণোপলক্ষে যাঁহারা বাটীতে পোড়া ঘুটীং বা বাথার আনিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে, জলসংস্পর্শিত হইলে কিরূপ সহজে সে গুলি আপনা হইতে ফাটিয়া ক্রমশঃ ধূলিবৎ সূক্ষ্ম হইয়া যায় এবং যতই চূর্ণ হইতে থাকে, ততই তাহার ভিতর হইতে উত্তাপ

ও বাষ্প নির্গত হইতে থাকে। চূণের এই অবস্থাকে Slaked lime কহে। উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার উত্তাপ ও দাহিকাশক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। ক্ষণকাল এতদবস্থায় অনাবৃত স্থানে থাকিলে বায়ুমণ্ডল হইতে উহা অক্সিজেন আহরণ করতঃ অধিকতর ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় অথবা অধিকতর ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবে উহা কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী হইতে পারে।

চূণের পাথরকে (limestone) যে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হয়, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য—উহার অভ্যন্তর হইতে জলের অংশ এবং আবদ্ধ বায়ুকে বাহির করিয়া দেওয়া এবং উহাকে শীঘ্র ও অল্প খরচে ধূলিরাশিতে পরিণত করা। এই প্রস্তরকে অতিরিক্ত দগ্ধ করিলে কোন কোন সময়ে অপরিষ্কার কাচ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। যাহা হউক পাথরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ভাঙ্গিয়া অগ্নিতে দিলে, অধিক অগ্নির বা অধিকক্ষণ অগ্নিতে রাখিবার আবশ্যক হয় না।

সদ্যোজাত চূণ বড়ই উত্তাপসংযুক্ত, এজন্য উহা ভাঁটী (Kiln) হইতে আনিয়াই জমিতে না দিয়া কোন স্থানে প্রসারিত করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। এইরূপে প্রসারিত থাকিলে বায়ুমণ্ডল হইতে বায়ু, তৎসহ কার্ব্বণিক-এসিড নামক বায়বীয় অম্ল, উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তদন্তর্গত উত্তাপের হ্রাস করে, তন্নিবন্ধন উহার দাহিকাশক্তিও কমিয়া যায়। বলা বাহুল্য, ২।৪ দিনের অধিক ঐরূপ অবস্থায় রাখা উচিত নহে, কারণ অধিক দিবস অনাবৃত স্থানে থাকিলে রাত্রিকালের শিশিরে চূণের উপরিভাগ জমাট বাঁধিতে পারে, কিম্বা বৃষ্টি লাগিলে সমস্ত চূণই ঢেলা বাঁধিয়া গেলে, উহার কার্য্য-

কারিতা হ্রাস পায়। এই অবস্থায় উহা ক্ষেত্রে প্রদান করিলে কোন স্থলে অধিক কোন স্থলে অল্প চূণ পড়ে। ফলতঃ ক্ষেত্রস্থ সমগ্র ফসল তাহার উপকারিতা সমভাবে সম্ভোগ করিতে পায় না।

বর্ষাগমের অন্ততঃ দুই মাস অগ্রে কিম্বা বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইলে যখন মৃত্তিকায় আর্দ্রতা না থাকিবে, এরূপ সময়ে ক্ষেত্রে চূণ দিতে হয়। আর্দ্রাবস্থায় মাটিতে চূণ দিলে, মাটি ও চূণে মিলিত হইয়া, কঠিন ঢেলা বাঁধিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মৃত্তিকার নিম্নস্তরেও কতক চূণ নামিয়া গিয়া নিম্নস্তরের (sub-soil) মৃত্তিকার ছিদ্রপথ (pores) রুদ্ধ করিয়া দেয়। একদিকে ঢেলা বাঁধিয়া গিয়া মৃত্তিকার যেমন ঘোর অনিষ্ট হইয়া থাকে, অন্যদিকে আবার নিম্নস্তরের ছিদ্রপথ রুদ্ধ হইয়া যায় ফলতঃ বৃষ্টির জল আর ভূমির গর্ভদেশে প্রবেশ করিতে পারে না। কাজেই সমস্ত জলই জমি হইতে উপরিভাগ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়, অথবা, আল্-বাঁধা জমি হইলে, ক্ষেতের জল ক্ষেতেই থাকিয়া শুকাইয়া যায়। ক্ষেত্রে জল আবদ্ধ থাকা অথবা তাহার উপর দিয়া জল নিকাশ হওয়া অপেক্ষা, মৃত্তিকায় জল প্রবেশ করিয়া অভ্যন্তরস্থ ছিদ্রপথ (Capillary tubes) দিয়া জল নিকাশ হইয়া যায়, কিম্বা নিম্নস্তরে নামিয়া যায়, ইহাই কৃষকের পক্ষে বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

চূণ প্রসারণ।—ক্ষেত্রে চূণ ছড়াইবার একটী বিশেষ প্রণালী আছে। ক্ষেত্র যখন শুষ্ক থাকিবে, তখন উহার উপরে ধীরে ধীরে চারিদিকে সমপরিমাণে চূণ ছড়াইতে হইবে। বায়ুর বেগ প্রবল থাকিলে অনেক চূণ উড়িয়া যায়, সুতরাং সেরূপ সময়ে, উহা হইতে বিরত থাকিলে লাভ আছে। তাহা ছাড়া চূণ দিবার পূর্ব্বে একবার ক্ষেত্রে হলচালনা করাইয়া লইলে,

আরও ভাল হয়। চূণ দেওয়া হইয়া গেলে, উহাকে মৃত্তিকার সহিত সমভাবে ও সূক্ষ্মরূপে মিলিত করিবার জন্য বারম্বার জমিকে চষিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। এক দিনে বারম্বার লাঙ্গল না দিয়া, ২।১ দিবস অন্তর একবার করিয়া লাঙ্গল দিলে, অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার পাওয়া যায় কারণ, প্রতি দুইবার লাঙ্গল দিবার মাঝখানে যে সময় পাওয়া যায়, তাহাতে নিম্নস্থিত মৃত্তিকা উপরে আসিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে অনেক বাষ্পীয় পদার্থ আহরণ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন, মৃত্তিকায় যে দোষ ছিল, তাহা বায়ুমণ্ডল, আলোক ও সূর্য্যোত্তাপ বশতঃ সংশোধিত হইয়া যায়। অধিকন্তু, সেই চূণও বায়ুমণ্ডল হইতে বহুল পরিমাণে কার্ব্বনিক-এসিড সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। এইরূপে কয়েক দিন অন্তর মৃত্তিকা কর্ষণ করিলে, মৃত্তিকাভ্যন্তর যতটা কর্ষিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত মাটি পর্য্যায়ক্রমে সংশোধিত হইয়া এবং বাহ্য পদার্থ সংগ্রহ করিয়া অধিকতর উর্ব্বরা হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৃত্তিকায় চূণ সংযোজিত হইলে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ, দুইভাবে উহা কার্য্য করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উহার এমন একটী শক্তি আছে, যাহার দ্বারা উহা বায়ুমণ্ডলের বাষ্পীয় পদার্থ শোষণ করতঃ উদ্ভিদের নিকটে আনিয়া দেয়। মৃত্তিকা-মধ্যে আরও অনেক পদার্থ থাকে, কিন্তু তৎসমস্ত অনেক সময়ে চূণের অভাবে হয়ত নিষ্ক্রিয় থাকে। হিউমস্ (Humus) নামক যে মৃত্তিকার একটা প্রধান উপকরণ, তাহাও চূণের অভাবে কার্য্যকরী হইতে পারেনা, বরং যেখানে এই হিউমসের আতিশয্য থাকে, অথচ চূণেরও অভাব থাকে, সেস্থলে প্রথমোক্ত পদার্থের অল্পপ্রাচুর্য্যবশতঃ জমির ও উদ্ভিদের বিশেষ ক্ষতি করে। ঈদৃশ

অম্লাক্ত জমিকে sour land কহে। অম্লাক্ত জমিতে চূণ দিলে, জমির অম্ল-দোষ কাটিয়া যায়, এবং যে নিষ্ক্রিয় গলনীয় হিউমস্ পদার্থ হইতে ক্রমিক অম্ল উদ্ভূত হইতেছিল, তাহারও হ্রাস হয়। অতঃপর সেই চূণের সংযোগ হেতু হিউমস্ বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে।

মৃত্তিকার অন্তর্গত সিলিকেট্ (Silicate) নামক যে ধাতব পদার্থ থাকে, তাহাও চূণের সংস্রবে আসিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহার যে সার পদার্থ ইতঃপূর্ব্বে তাহাতেই আবদ্ধ ছিল, তাহা এক্ষণে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হইয়া থাকে।

চূণ ব্যবহারের ফলাফল।—মৃত্তিকায় চূণ সংযুক্ত হইলে তন্মধ্যস্থিত তাবৎ পদার্থকে উহা চারিদিক হইতে টানিয়া আনিয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়। সুতরাং প্রথম প্রথম ইহার দ্বারা চাষ আবাদের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু সেই জমি অল্পদিন মধ্যে—দুই চারি বৎসর মধ্যে এমন ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, তখন উহার একটী তৃণকেও পোষণ করিবার শক্তি থাকে না। এই জন্য ইয়ুরোপীয় চাষীদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ হইয়া গিয়াছে যে, Lime enriches the father and impoverishes the son. পূর্ব্বে একথাটা খাটিত, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে লোকের সে ভুল-সংস্কার ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। তখন লোকে চূণের উপকারিতা শুনিয়াই জমিতে চূণ প্রয়োগ করিত, চূণ ও স্বীয় ধর্ম্মবশে জমিকে শীঘ্রই সারবান করিয়া দিত এবং চাষীগণ তাহাতে বেশ দুপয়সা লাভ করিত। কিন্তু ক্রমে যখন তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িত, তখন মাথায় হাত দিয়া বসিত। জমিতে এক দিকে যেমন চূণ দিতে হইবে, অন্যদিকে আবার

তেমনই সমধিক পরিমাণে অন্য সার দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন কেন না, তাহা না দিলে ইয়ুরোপীয় চাষীদিগের প্রবাদ সপ্রমাণ হইবে। ক্ষেত্রের সঞ্চিত সার-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া গেলে, কেবল চূণ কোথায় এত সার পাইবে যাহাতে বরাবর ক্ষেত্র সার-পূর্ণ থাকিবে? এক দিকে যেমন মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত খরচ হইতে থাকিবে, অন্যদিকে আবার সেই পরিমাণ সার জমিকে যোগাইয়া দিলে, তবে চূণ তাহাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে পারে।

চূণের তীক্ষ্ণতা বা উগ্রতা এবং প্রয়োগের পরিমাণানুসারে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত উহার কার্য্যকারিতা থাকিতে দেখা যায়। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। নূতন ও তীব্র চূণের উত্তাপ ও তীব্রতা হ্রাস হইতে কিছু সময় লাগে। তাহা ব্যতীত তীব্রতার জন্য মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত অনেক সার পদার্থেরও গুণের হ্রাস হইয়া থাকে। উপরন্তু, চূণের তীব্রতা থাকিতে উহাতে কোন ফসলই জন্মিতে পারিবে না। তবে যদি আবাদ করিবার পূর্ব্বে অধিক সময় পাওয়া যায়, তাহা হইলে তীব্র চূণ দিতে তত আপত্তি নাই, বরং তাহা দ্বারা আরও উপকার হইতে পারে এই যে, মৃত্তিকার মধ্যে যে সমুদায় কীট থাকে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। নানাবিধ গাছ পালায় চূণ প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, নূতন ও পুরাতন, অধিক ও অল্প, চূণ প্রয়োগ করিয়া কখনও সুফল লাভ আবার কখনও ক্ষতি হইয়াছে।

চূণ বহু পুরাতন হইলেও উহার তেজ ও গরম সহজে যায় না। বহুকালের পুরাতন ছাদের ভগ্নাবশিষ্ট রাবিস-মধ্যে যে চূণ থাকে, তাহাতেও দেখিয়াছি, উহার তীব্রতা বিনষ্ট হয় নাই। নূতন চূণের ত কথাই নাই। কয়েক বৎসর হইল, একবার

আমি বিবিধ ফলকর বৃক্ষে চূণ ব্যবহার করি। কিন্তু সদ্যোজাতচূণ প্রয়োগ করায় গাছের যে সমূহ অনিষ্ট হয়, তাহা বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছি। চূণের কার্য্য সদা উদ্ভিদশরীরে প্রয়োগ করিতে যাওয়া ভ্রম। যদি নিতান্তই জীবিত ও বৃদ্ধিশীল কোন গাছে দেওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ১০।১৫ দিবস পূর্ব্বে কোন সারের সহিত চূণ মিশাইয়া এবং মধ্যে মধ্যে উহাতে জল দিয়া, প্রথমে চূণের তেজ নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত।

ছাদ-ভাঙ্গা রাবিসের কথা যে বলিয়াছি, তাহাতে বিশেষ উপকার পাইয়াছি বটে, কিন্তু উহা সদা ব্যবহার করি নাই। মাটি ও সারের সহিত অল্প পরিমাণে মিশাইয়া লইতাম। সে স্থলে পাণ্ডবপোড়া বা বোদমাটিই প্রায় ব্যবহৃত হইত। উল্লি-খিত মৃত্তিকা ভূগর্ভ হইতে এক সুবিস্তৃত স্তরে পাওয়া গিয়াছিল। উহা বহুকাল পূর্ব্বের ঔদ্ভিজ্জ পদার্থের সারাংশ মাত্র। পাণ্ডবপোড়া মাটি বাষ্পীয় সারে ও দাহ্য পদার্থে পূর্ণ, কিন্তু চূণের সংস্রব ব্যতীত উহার কোন কার্য্য করিবার শক্তি জন্মে নাই। চারাঘর ও প্রদর্শনী (Nursery ও Conservatory) ঘরের তাবৎ টবে রাখিবার উপ-যোগী নানাবিধ বহুমূল্য দেশী ও বিলাতী গাছ পালার জন্য আমরা ঐ পাণ্ডবপোড়া মাটি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতাম। কিন্তু যখন উহা ব্যবহার করিতাম, তখনই উহার সহিত অল্লাধিক পরিমাণে সেই পুরাতন রাবিস ব্যবহার করিতাম। ব্যবহার করিবার অন্ততঃ এক দিবস পূর্ব্বে উক্ত রাবিসকে উত্তমরূপে ভিজাইয়া দেওয়া হইত; সুতরাং চূণের তেজ অনেকটা হ্রাস হইয়া যাইত। আর একবার একখণ্ড জমিতে চূণ দেওয়া যায়, তাহার প্রায় মাস খানেক পরে উহাতে আলু রোপণ করা হয়। মাটি তখন ভিজা থাকায় চূণের তেজ

অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল বটে, কিন্তু মাটির সহিত তখনও উত্তমরূপে মিশিতে পারে নাই, সেজন্ত অনেক আলুর গাছ উদ্ভেদিত হইয়াও, অধিকদিন সুস্থ থাকিতে পারে নাই এবং কতক আলু চূণের সংস্পর্শে থাকিয়া দাগী হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে চূণ প্রয়োগ দ্বারা আলুর কোন উপকার না হইয়া কতক পরিমাণে ক্ষতি হইয়া থাকিলেও, পরবর্ত্তী ফসলে কিন্তু তাহার উপকার বুঝিতে পারা গিয়াছিল।

চূণ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বিশেষ রূপে বিবেচনা করা উচিত;—

১। মৃত্তিকার জাতি অর্থাৎ উহা বেলে, দো-আঁশ, কি এঁটেল?

২। মৃত্তিকা মধ্যে চূণের অংশ কি পরিমাণ আছে।

৩। জমিতে চূণ দিবার সঙ্গে বা পরে উহাতে সমূহ পরিমাণ সার সংযোগ করিতে কৃষক প্রস্তুত কি না?

উল্লিখিত প্রথম দুইটী বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, মৃত্তিকা পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। তৃতীয় বিষয় সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে যে, সার না দিয়া কেবল চূণ প্রয়োগ করিলে জমি একবারে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। বিনা সারে চূণ প্রযুক্ত করিলে দুই এক বৎসর জমি হইতে উত্তম ফসল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মৃত্তিকায় অবস্থিত সারভাগ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেলে সে জমির আশা-ভরসা পরিত্যাগ করা উচিত। জমি যাহাতে বরাবর সারপূর্ণ থাকে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। জমিই কৃষকের মূলধন এবং তাহার উপস্বত্বই কৃষকের ভোগ্য। ক্ষেত্র হইতে অপরিমিত ফসল লইয়া তাহাতে

সার সংযোজিত না করিলে মূলধন ভাঙ্গিয়া খাওয়া হয়, মূলধনও অল্পদিনে নিঃশেষিত হইয়া যায়। কিন্তু যিনি জমির জিনিস জমিতে বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারেন অর্থাৎ প্রত্যেক ফসলের জন্য যে পরিমাণ সার জমি হইতে খরচ হইয়া যায়, তাহা উহাতে পুনঃ সংযোজিত করেন, তিনিই প্রকৃত বিচক্ষণ এবং তিনিই প্রকৃত মূলধন খরচ না করিয়া উপসত্ত্বের যথাযোগ্য ব্যবহার করেন। আমাদিগের ভারতীয় কৃষককুল যে সারের উপকারিতা বুঝে না তাহা নহে, তবে দরিদ্রতাবশতঃ কার্য্যতঃ ততটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে না।

সাধারণতঃ দেখি, কৃষকগণকে প্রায় ঋণ করিয়া চাষ-আবাদ করিতে হয়। তারপর গোময় বা গৃহস্থালীর যে সকল উচ্ছিষ্ট তাঁহাদিগের গৃহে জমা হয়, জ্বালানীকাঁষ্ঠের অভাবে তৎসমুদায় তাহাদিগকে পোড়াইয়া রন্ধনাদিকার্য্য সমাধা করিতে হয়, কিম্বা ঘুঁটে প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে হয়। এইরূপে সারের উদ্ভিজ্জ ও বাষ্পীয় পদার্থ উড়িয়া গিয়া কেবল তাহার ভস্মাবশেষ থাকে। এই ভস্মাবশিষ্ট স্থূলপদার্থটাও যদি মাটির সহিত সংযোজিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও অনেক কাজ হইতে পারে কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়াও ত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। এইরূপ নানাবিধ কারণে আমাদিগের কৃষকদিগকে চাষ-আবাদের জন্য প্রকৃতির উপরে নির্ভর করিতে হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি জমির প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করেন, তাহা হইলে নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। আর যদি এইরূপ ব্যবহারই হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে চূণ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই না। চূণ প্রয়োগে জমি খারাপ হইয়া যায়,

এই যে একটা সাধারণের ধারণা আছে, ইহা ভূ-স্বামীর পক্ষে মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। কেননা, সাধারণ লোকে যদি বিনা সারে জমিতে চূণ প্রয়োগ করে, এবং দুই চারি বৎসর তাহাতে আবাদ করিয়া তাহার সমুদয় সত্ব নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে জমি আর অপর প্রজারা লইবে কেন? আর যদিই লয়, তবে ৪৲ টাকার স্থানে হয়ত আট আনায় লইবে,—কিন্তু ইহাতেও তাহার ক্ষতি। কেন না, তাহারও এমন সঙ্গতি নাই যে, বহুল পরিমাণে সার দিয়া তাহার পঙ্কোদ্ধার করে। এই জন্য গোলা লোকদিগকে চূণ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া ভাল নহে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বটে, কিন্তু কৃষি বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু লোক বড় বিরল। সমস্ত কৃষিকার্য্যটাই এদেশে দরিদ্র কৃষকদিগের উপরে চাপান আছে। সুতরাং তাহার আর কোন উন্নতি ঘটিয়া উঠিতেছে না। চূণের কথা যে আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহা এদেশে সম্পূর্ণই নূতন। চূণ পদার্থটাই যে কৃষিকার্য্যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা এদেশের সাধারণে জানে না। স্থানে স্থানে পরীক্ষা হিসাবে অল্প স্বল্প ব্যবহার হইতেছে মাত্র, সুতরাং ইহার বিষয় জানিবার, শুনিবার, শিখিবার অনেক আছে। ইউরোপেও যে ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে গৃহীত হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। এখনও ইহা তথায় পরীক্ষার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তথাপি এ পর্য্যন্ত যত কৃষি-রাসায়নিক ও কৃষিকার্য্যনিরত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ইহার পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে চূণের কার্য্যকারিতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, মৃত্তিকা মধ্যে যত প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে, তত্তাবৎই চূণের সংস্পর্শে আসিলে ক্রমশঃ

বিগলিত হইতে থাকে এবং শেষে এমন অবস্থায় পরিণত হয় যে, উদ্ভিদগণ অনায়াসে শিকড়ের দ্বারা তাহা আহরণ করিতে সমর্থ হয়। গলনীয় পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইলে, তন্মধ্যস্থিত অম্লাংশ চূণের সহিত মিলিত হয়, সুতরাং অম্লের দোষ কাটিয়া যায়। যে জমিতে উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থের আতিশয্য, তথায় কোন ফসল সুচারুরূপে জন্মিতে পারে না, কিম্বা জন্মিলেও তাদৃশ কোমল বা সুতার বা সুমিষ্ট হইতে পারে না। অস্থিচূর্ণ বা অস্থিভস্ম ফলের গাছে দিলে যে, ফলের আস্বাদ অধিক পরিমাণে মধুর ও সুস্বাদু হয়, তাহার অন্যতম কারণ—অস্থির চুণাংশ মৃত্তিকার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়, উপরন্তু অন্য পদার্থ সমূহকে বৃক্ষের ব্যবহারোপ-যোগী করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত হাড় নিজেই একটা বিশেষ সার তাহা আমরা অবগত আছি। অম্লময় ও কষায় জমির পক্ষে চুণ একটী বিশেষ সার। অধিক কি, এরূপ জমিতে চুণ প্রদান করিলে, উহার তাবৎ দূষিত অম্ল একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, এজন্য টোকো জমির পক্ষে ইহা মুষ্টিযোগ বলিলেই হয়। অতঃপর উহা সেই অম্লের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ লবণ উৎপন্ন করিয়া উদ্ভিদের সহায়তা করে। চূণের সাহায্যে অনেক ধাতব নিষ্ক্রিয় পদার্থও ক্রিয়াশীল হইয়া উদ্ভিদের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করে।

পাকাচূণ অপেক্ষা কাঁচাচূণের মূল্য যেমন অপেক্ষাকৃত কম, তেমনি ইহার তেজও অল্প, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী। কাঁচাচূণ ধীরে ধীরে কাজ করে, সুতরাং মাটিকে শীঘ্র নিস্তেজ করিতে পারে না, অপিচ ব্যবহারে ভয়ের কোন কারণ নাই। তবে, ইহা বাজারে যেরূপ অবস্থায় বিক্রিত হয়, তাহা অতি স্থূল, এজন্য মৃত্তিকার সহিত শীঘ্র মিশিয়া যাইতে না পারিয়া, গুরুত্ব বশতঃ নিম্নস্তরে চলিয়া যাই-

বার সম্ভাবনা। উহাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ ছাঁকিয়া, মিহি অংশ ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত। অবশিষ্ট স্থূলাংশকে পুনরায় ঢেঁকিতে কুটিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যথানিয়মে ব্যবহার করিতে হইবে। সহর বা সহরের সন্নিকটে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে চূণ সংগ্রহ করা বড় কঠিন নহে, যাঁহার ইচ্ছা আছে এবং অর্থ ব্যয় করিবেন তিনিই উহা আনিয়া ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু সুদূর মফঃস্বলে সচরাচর উহা পাওয়া দুষ্কর, তাহা ব্যতীত সাধারণ কৃষিজীবিগণ অর্থ ব্যয় করিয়া চূণ খরিদ করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং তাহাদিগের জন্য আমরা আর একটী সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিব। পল্লীগ্রামের বাহিরে যে সব গো-ভাগাড় থাকে, তাহাতে নানাবিধ জীব জন্তুর অস্থি পড়িয়া থাকে। লোকে যদি কোন উপায়ে সেইগুলি সংগ্রহ করতঃ নিজ ক্ষেত্রে আনিয়া জ্বালাইয়া দেয় অথবা কিঞ্চিৎ পয়সা খরচ করিয়া ভাঙ্গাইয়া চূর্ণ করিয়া লয়, তাহা হইলেও চূণের অনেক কার্য্য হইতে পারিবে। অস্থি বা শামুক-চূর্ণ বা ভস্ম মধ্যে চূণ সমধিক পরিমাণে থাকে। তাহা ব্যতীত উহাতে ফস্‌ফরাস্, পোটাস ও অন্যান্য পদার্থ থাকায়, মৃত্তিকার সমধিক উপকার দর্শিয়া থাকে।

যে সকল জমির মাটিতে অম্লের (acid) আধিক্য থাকে, তাহাতেই চূণ প্রযোজ্য। প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই অল্পাধিক পরিমাণে অম্ল থাকিতে দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, গাছের পাতা ফল ফুল শিকড় অথবা মৃত নানাবিধ জীব-দেহ বিগলিত হইয়া মৃত্তিকা মধ্যে হিউমস্ (Humus) রূপে অবস্থান করে। এই দ্রবনীয় পদার্থে সমধিক পরিমাণে অম্ল থাকে। ক্রমাগত যদি জমিতে এইরূপে উক্ত পদার্থ সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহা

হইলেই জমি অম্লাক্ত হইয়া যায়। অম্লাক্ত মাটিতে নাইট্রোজেন নামক যে পদার্থ থাকে, অথবা বায়ুমণ্ডল হইতে সঞ্চিত হয়, তাহা মটর, অড়র, কলাই, মুগ প্রভৃতি গাছ সমধিক পরিমাণে আহরণ করিতে পারে। কিন্তু ইহার আতিশয্যবশতঃ গাছ ভালরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। সেই জমিতে চূণ প্রযুক্ত হইলে, অম্লের ভাগ কাটিয়া গিয়া উদ্ভিদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। মানুষে যেমন অতিরিক্ত অম্ল খাইতে পারে না বলিয়া উহাতে লবণ ব্যবহার করে, উদ্ভিদের পক্ষে চূণও সেই কার্য্য সম্পন্ন করে। অম্ল ও লবণের সামঞ্জস্য হইলে তবে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। এইজন্য অতিরিক্ত লবণাক্ত জমিতে জৈবসারের প্রয়োজন হয় এবং অম্লাক্ত জমিতে চূণ দেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে।

অম্ল ও লবণ পরীক্ষা।—অম্লাক্ত ও লবণাক্ত জমিকে চিনিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন নহে। কিয়ৎ পরিমাণ মাটি জমি হইতে আনিয়া, একটা পাত্রে জলের সহিত গুলিতে হয়। এবং ক্ষণকাল একটা কাটি দিয়া তাহাকে নাড়িতে হয়। ইহাতে মাটি জলের সহিত বেশ মিশিয়া যায়। তাহার পরে উহাকে আধ ঘণ্টাকাল স্থির হইতে দিলে, স্থূল পদার্থ নিম্নে গিয়া পড়িবে। তখন একখানি ছুরীর মুখ (blade) দিয়া সেই জলমধ্যস্থিত কাদা উঠাইয়া লইয়া একখণ্ড সবুজ 'লিটমস্' কাগজ দ্বারা ৪।৫ মিনিট কাল চাপিয়া ধরিবে যদি সেই মাটিতে চূণের ভাগ থাকে, তাহা হইলে সবুজ 'লিটমস্' কাগজ লালবর্ণে পরিণত হইবে। আর যদি অম্লের অস্তিত্ব পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কাদা লাল বর্ণের 'লিট্মস্' কাগজ দ্বারা চাপিয়া ধরিলে উহা সবুজবর্ণ ধারণ করিবে। মোটামুটি এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, মাটিতে অম্লের

কি লবণের ভাগ বেশী আছে। উভয় প্রকারের লিট্‌মস কাগজ (Litmus paper) স্বল্পমূল্যে ডাক্তারখানায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা মধ্যে বালুকা, এঁটেলমাটি, চূণ বা লবণ, জৈবপদার্থ বা অম্ল—কি কি পরিমাণে আছে, তাহা এ প্রবন্ধে উল্লেখ্য নহে। মৎপ্রণীত কৃষিক্ষেত্র' নামক পুস্তকে তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। মৃত্তিকার গুরুত্ব বা লঘুত্ব, এবং অম্লের অল্লাধিক্য বুঝিয়া, বিঘা প্রতি দুই হইতে পাঁচমণ চূণ দেওয়া যাইতে পারে। জমিতে চূণ প্রয়োগ করিবার কালে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন স্থানে অধিক বা কোনস্থানে অল্প না পড়ে, এজন্য চূণ যথেষ্ট ঝুরা হওয়া আবশ্যক। অসমভাবে চূণ বিস্তৃত হইলে কোন স্থানে উপকার, আবার কোন স্থানে অপকার হওয়া অতিশয় সম্ভব। ফলতঃ তাহাতে ফসলেরও ইতরবিশেষ হইবে। আর এক কথা এই যে, ক্ষেত্রে চূণ দিবার অব্যবহিত পরেই যাহাতে ইহা মৃত্তিকার সহিত সম্মিলিত হয় বা মিশিয়া যায়, তাহার জন্য অনতিবিলম্বে ক্ষেত্রে বারম্বার হলচালনা করা একান্ত আবশ্যক। কেন না, বিলম্ব করিলে, মৃত্তিকার রসে চূণ নিজেই জমাট বাঁধিয়া যাইতে পারে, অথবা চূণ ও মাটি উভয়েই কঠিন ঢেলায় পরিণত হইতে পারে। বর্ষাকালে জমিতে সমধিক রস থাকে, এজন্য সে সময়ে ক্ষেত্রে আদৌ চূণ দেওয়া উচিত নহে।

চূণের আর একটী বিশেষ গুণ আছে, তাহা এই যে, উহা ম্যালেরিয়ার কীটাণু বিনাশ করে। এজন্য দূষিত জলে চূণ দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অনেকে জানেন যে, কোন পুষ্করিণী বা কূপের জল দূষিত বা দুর্গন্ধযুক্ত হইলে, তাহাতে চূণ দেওয়া

হইয়া থাকে। ইহাতে জলের সেই দোষ ও দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয় এবং তাহাতে ম্যালেরিয়ার কীটাণু থাকিলে তাহা মরিয়া যায়। ঘর বাড়ীতে যে, সময়ে সময়ে চূণকাম বা কলি দিবার রীতি আছে, তাহারও এই কারণ। ফরাসী দেশের ডাক্তার রধি সাহেব বলেন যে, মাটিতে বা জলে সমধিক চূণ থাকিলে, স্থানীয় অধিবাসিগণের ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তিনি আরও বলেন যে, পিসাই (Puisaye) গ্রামের ক্ষেত্রে চূণ ব্যবহার হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি ম্যালেরিয়া তথা হইতে দূরীভূত হইয়াছে। অপর চিকিৎসাতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার গিরেট সাহেবও সেই মত পোষণ করিয়া বলেন যে, ফ্রান্সের ম্যালেরিয়াপূর্ণ নানা প্রদেশে, কৃষিকার্য্যে চূণ ব্যবহৃত হইয়াছে, ম্যালেরিয়ার অনেক উপশম হইয়াছে। ফ্রান্স দেশে এই বিষয় লইয়া বিশেষ পরীক্ষা চলিতেছে,—এবং যদি যথার্থই ইহা সপ্রমাণ হয় যে, চূণ ম্যালেরিয়া নাশক, তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে, মৃত্তিকায় চূণের অভাব বশতঃই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা ও আসামের ন্যায় ম্যালেরিয়াগ্রস্তদেশে যাহাতে চূণটা কৃষিকার্য্যে সাধারণ লোকে ব্যবহার করিতে শিখে ও করে, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। ম্যালেরিয়ার কারণ, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌-দিগের বুঝিবার ও অনুসন্ধান করিবার বিষয়ই বটে, তথাপি আমরা সহজ জ্ঞানেও বুঝিতে পারি যে, চূণ পদার্থটা দূষিত স্থান ও দূষিতজলকে সংশোধন করে এবং তাহা হইলেই ম্যালেরিয়ার কারণ বিনষ্ট হয়। চূণ ব্যবহারে কৃষিরও যেমন উপকার হইবে, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যেরও তেমনি উন্নতি হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে

এতৎসম্বন্ধে 'Tropical Agriculturist' পত্রিকায় যাহা লিখিত হইয়াছিল নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল—

"Everything that tends to add to our knowledge of Malaria—whether as regards the conditions which increase its spread or virulence, or the agencies which help to reduce its evil influence —is of interest to us as inhabitants of an Island which, despite its general healthiness, yields more victims to malarial fever than to any other ailment or epidemic. Indeed, fevers account for more deaths, probably, than all other diseases combined; and malarial fever is more widely prevalent among us that any other: and if it is not directly fatal to the same extent as other fevers, it enfeebles and ultimately conquers in most cases in which prompt treatment is not followed by adequate nourishment and care. It is, therefore, encouraging after all the literature that has confronted us on the mosquito,— which is a troublesome enough customer without being reckoned as an active agent in inoculating one with malarial poison to find that there is something to set against the mischievous mosquito. Though one may not be able to overpower the diminutive

enemy directly with a coat of lime, lime has been found indirectly to be a potent agent against malaria. In France, Dr. Rodhe has discovered that the presence of lime in the soil or in the water, helps to exterminate malaria; and it is a curious illustration of the inter-dependence of widely different industries that this medico-scientific discovery was first made in connection with experiments in Manuring! This fact is particularly interesting to us as advocates, in season and out of season, of adding to the fertility of the soil by the judicious use of manures. The disappearance of marsh malaria from Puisaye, after lime had been used in the district as a fertiliser, led to investigations which are still being carried on, and which reasonably point to the probability that in lime a very effective agent has been found to neutralise the spread of malaria. Another medical man Dr. Grellet, has taken up the suggestion, and he has written to the *Revue Hygiene*, that the liming of the soil for agricultural purposes, in various provinces in France which were more or less affected by malaria, has resulted in the reduction of malarial cases, almost in proportion to the quantity

of lime used. It is for experts to say whether his statement that, in many countries whose conditions favour the existence of malaria, the freedom or prevalence of malaria is the accompaniment of a calcareous soil is true."—

তরলসার।*

উদ্ভিদে তরলসার দিলে দুইটী বিশেষ মহদুপকার সংসাধিত হয়। প্রথম,—ইহার দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধিশীলতার পরিবৃদ্ধি হয়; দ্বিতীয়,—উদ্ভিদের ফলন-ফুলনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হয়। তবে তরল-সার কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, কোন্ কোন্ পদার্থ হইতে সচরাচর উৎকৃষ্ট তরলসার প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয় পরিজ্ঞাত থাকা যেমন আবশ্যক, উদ্ভিদের কোন্ অবস্থায় ও কি কি উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উহার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তাহাও বিশেষরূপে জানিয়া রাখা উচিত। আমি নিজে তরলসার ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী এবং প্রায় বারোমাসই উহা নানাবিধ তরি-তরকারী ও ফুলগাছে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরিতরকারী হউক, অথবা নানাবিধ ফুলের গাছই হউক, উদ্ভিদের অবস্থা ও অভাব বুঝিয়া, অল্পাধিক পরিমাণে ইহার ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়া থাকে।

---

* গ্রন্থকারলিখিত এই প্রবন্ধটী সন ১৩০৯ সালে ৩য়া শ্রাবণ তারিখের 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হয়।

উদ্ভিদে যে সকল সার প্রদেয়, প্রায় তাহার অধিকাংশই তরল-সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। স্থূল সারকে জলে গুলিয়া তরল করিয়া লইলেই তরলসার হয়। তবে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, বিগলিত পদার্থকে জলে মিশ্রিত করিয়া লইলে যেমন উহার কার্য্য শীঘ্র ফলপ্রদ হইয়া থাকে, সদ্য বা টাটকা জিনিসের তরল সারে তত শুভ ও আশুফল প্রদান করে না। এ বিষয়ে কিন্তু মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, সার বিগলিত হইলে, উহা হইতে কতক পরিমাণে উত্তম পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়; দ্বিতীয় মত এই যে, টাট্‌কা জিনিষ গুলিয়া গাছে ব্যবহার করিলে আশানুরূপ উপকার পাওয়া যায় না। আমি কিন্তু প্রথমোক্ত মতের সমর্থন করি, কারণ, অনবরত পরীক্ষার ফলে ইহাই আমার বিশ্বাস যে, স্থূল পদার্থ বিগলিত হইলে উহার স্থূলাংশের অনেকটা পদার্থ বাষ্পাকারে এক দিকে যেমন চলিয়া যায়, অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই যে, এই উত্তাপহেতু সারের মধ্যে একটা ভৌতিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তন্নিবন্ধন সার-মধ্যস্থিত সারাংশেরও অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হয়। এতদ্ব্যতীত, সারের মধ্যে যে স্থূল পদার্থ অগলনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল, তাহাও উত্তাপবশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুতে পরিণত হয়; কাজেই উদ্ভিদ্‌গণ শীঘ্রই উহা আহরণ করিতে সমর্থ হয়। সারকে সদ্যই জলে গুলিয়া ব্যবহার করিলে যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, তাহার কারণ এই যে, সদ্য বা টাটকা সার-বিমিশ্রিত জল, গাছের গোড়ায় দিলেই মৃত্তিকা কর্ত্তৃক জল শীঘ্রই শোষিত হয়, আর স্থূলাংশ সাররূপে উপরে থাকিয়া যায়। কোন জিনিস বিগলিত করিতে হইলে, উহাতে রস ও উত্তাপ উভয়ই থাকা উচিত,—একের অভাবে

অন্যের কোন কার্য্য সংঘটিত হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক খণ্ড তৈল-পিষ্টক বা খোল শুষ্কাবস্থায় গাছের গোড়ায় ফেলিয়া রাখিলে কোন কাজই হয় না, কিন্তু প্রতিদিনের শিশিরপাত হেতু ক্রমে উহা বিচূর্ণিত হইতে থাকে, অন্যদিকে সূর্য্যোত্তাপের প্রকোপে উহার রূপান্তরিত হইতে থাকে। এইরূপে বিগলিত হইয়া সেই তৈল-পিষ্টকের পৃথক অস্তিত্ব যখন আর না থাকে, তখন উহার শক্তি উদ্ভিদে প্রকাশ পায়, কিন্তু সেই শক্তি কিম্বা তাহার গুণ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ক্রমে ক্রমে বিগলিত হইয়া উদ্ভিদশরীরে ক্রমে কার্য্য করিতে থাকে বলিয়াই উহার আশু উপকারিতা বুঝিতে পারা যায় না। স্থূলাবস্থায় মৃত্তিকায় সার প্রযুক্ত হইলে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইতে বিলম্ব হয়; কিন্তু যত বিগলিত হইতে থাকে, ততই উহার ক্রিয়া উদ্ভিদশরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূলসার মাটিতে প্রদান করিলেও, উহা তরল অবস্থায় পরিণত না হইলে কোন কার্য্য হয় না। স্থূলসার প্রদান করিবার পরে যদি তাহাতে জল সেচন না করা যায় কিম্বা যদি বারিপাত না হয়, তাহা হইলে সেই সার নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে, অথবা অতি ধীরে বিগলিত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত রসের সহিত সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে, ক্ষেত্রে স্থূলসার দিলেও উহা তরলাবস্থায় পরিণত হয়, তবে তাহার কার্য্য হয়।

রুগ্ন ও মড়াঞ্চে গাছে তরলসার দিলে উহাতে নব শক্তির সঞ্চার হয়, বৃদ্ধিশীল গাছে প্রদান করিলে উহাতে শীঘ্রই ফলন-ফুলনের শক্তি আনয়ন করে, ফুলের কুঁড়ির অবস্থায় দিলে ফুল বড় হয়, ফুলের গঠন-পারিপাট্য বাড়ে, ফুলের বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়;

ফলের মধ্যমাবস্থায় দিলে, ফল পুরিপুষ্ট হয়, সুপক হয় ও সুস্বাদ হয়। ইহাও বলিয়া রাখি যে, অবিবেচনার সহিত, বা অসময়ে কোন উদ্ভিদে তরলসার প্রদান করিলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। যে গাছটী বেশ বাড়িতেছে অথচ ফলফুল হইবার বিলম্ব আছে, তাহাতে অধিক পরিমাণে বা প্রতিনিয়ত এই সার প্রদান করিলে গাছ অনেক সময়ে ষাঁড়াইয়া যায় অর্থাৎ অতিশয় বৃদ্ধশীল হইয়া পড়ে। তখন আবার ইহার বৃদ্ধিশীলতা রুদ্ধ করিবার জন্য গাছের গোড়ার মাটি সমুহ-দুর ব্যাপিয়া কোদ্‌লাইয়া দিতে হয়, মৃত্তিকা চূর্ণ করিয়া দিতে হয়, ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কোদ্‌লাইয়া দিলে গাছের অনেক শিকড় কাটিয়া যায়, মৃত্তিকার আর্দ্রতার হ্রাস হয় সুতরাং গাছের আর তেমন বাড়িবার শক্তি থাকে না। গাছের শিকড় এইরূপে কাটিয়া গেলে এবং মাটির রস শুষ্ক হইতে থাকিলে, উদ্ভিদের শরীর মধ্যে একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, গাছ থম্‌কিয়া যায়। এই অবসরে গাছের শাখা-পল্লবাদি অপেক্ষাকৃত কাঠিন্য লাভ করে; ফলতঃ তখন উহার শক্তি ফলন-ফুলনের দিকে ধাবিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, বৃদ্ধিশীল গাছের শাখা-প্রশাখাদি ছাঁটিয়া দিলে তাহার বৃদ্ধিশক্তির হ্রাস হইবে, কিন্তু সেটা ভুল। গাছের শাখা-প্রশাখা কাটিয়া দিলে, আপাততঃ সেই কর্ত্তিতাংশের গতি রুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু ফলে সে গতিটা অপরাপর শাখাপ্রশাখার দিকে ধাবিত হয়, কিম্বা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ শিকড়সমূহের বৃদ্ধিসাধন করে। এইরূপে উদ্ভিদের এক অংশের গতি রুদ্ধ হইলে, অথবা শিকড়ের বৃদ্ধি হেতু শাখা-প্রশাখায় অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তি সঞ্চারিত হইলে, আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল কোথায়?

এতদ্বারা ত বৃক্ষকে অধিকতর বর্দ্ধিত হইবার পথে সহায়তা করা হইল।

সবজীবাগে আমি সমূহ পরিমাণে তরল-সার ব্যবহার করিয়া থাকি। বারোমাসের যোগান রাখিবার জন্য বাগানের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে বড় বড় চৌবাচ্ছা মধ্যে সার ভিজান থাকে। সার পচিতে আরম্ভ করিলে উহাতে রাশি রাশি ক্ষুদ্র কৃমিবৎ পোকা জন্মে, আবার তাহাই আপনা হইতে মরিয়া গিয়া সারের সহিত মিশিয়া যায়, এতন্নিবন্ধন সারের গুণও অধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সার পচাইলে উল্লিখিত প্রকারে আর একটী বিশেষ লাভ হইয়া থাকে। সাররক্ষিত পাত্রটীকে দিবারাত্রি ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক এবং জল কমিয়া গেলে পুনরায় সেই পাত্রে আবশ্যক মত জল দিয়া রাখিতে হয়। সার অতিশয় পুরাতন হইয়া গেলে উহার শক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে, এজন্য একেবারে অধিক সার না ভিজাইয়া, ব্যবহার করিবার দশ পনর দিন হইতে এক মাস কাল পূর্ব্বে ভিজাইতে দেওয়া উচিত। প্রতিনিয়ত যোগান রাখিবার জন্য দুই চারিটা পিপা বা বড় বড় মাটির গামলা রাখা প্রয়োজন; কারণ তাহা হইলে একটী পিপায় সার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবার অব্যবহিতকাল মধ্যে দ্বিতীয় পিপার বা পাত্রের সার তৈয়ারি করিবার উদ্যোগ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে আমি কেবল গোবর ও খইল স্বতন্ত্র এবং মিশ্রিতভাবে পচাইয়া ব্যবহার করিতাম কিন্তু একবার উহাদিগের প্রত্যেকের সহিত অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দেওয়ায় সার অতি সুন্দর ও উপাদেয় হইয়াছিল। এই অস্থি ও খইল মিশ্রিত তরল-সার সে-বৎসর ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি অনেক গাছে দিয়াছিলাম। তাহার ফলে গাছগুলির বৃদ্ধি যে কি সুন্দর হইয়া

ছিল, গাছের কি চমৎকার পুষ্টি হইয়াছিল, তাহা আর বর্ণনা কি করিব! সেই অবধি বারোমাস তরল-সার ক্ষেতে মজুত রাখিতাম ও ব্যবহার করিতাম।

চারা-অবস্থা হইতেই তরলসার অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারিলে গাছ সুপুষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্য কপি প্রভৃতির বীজ হইতে চারা জন্মিবার পরেই উহাতে আমি এক দফা তরলসার দিয়া থাকি। হাপোরে বসাইয়া দুই তিন বার এবং ক্ষেতে বসাইয়া দুই তিন বার দিই এবং তাহারই ফলে সুন্দর তরি-তরকারি জন্মে। পাত্র হইতে তরলসার উঠাইয়া অন্য কোন স্বতন্ত্র পাত্রে লইয়া, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া লইতে হয়। অনন্তর সেই জলীয় সার গাছের গোড়ায় দিতে হয়। রস টানিয়া গেলে, দুই এক দিন মধ্যে গোড়ায় মাটিতে যো হইলে গাছের গোড়াগুলি আস্তে আস্তে একবার নিড়াইয়া বেশ করিয়া মাটির সহিত সারের সরকে উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। অতঃপর উত্তমরূপে গাছে জলসেচন করা বিধি।

বর্ষাকালে তরলসার ব্যবহার করিবার পক্ষে আমি কোন আবশ্যকতা উপলব্ধি করি না। আকাশের জল স্বভাবতঃই সারময়, তবে দেশবিশেষে কোন স্থানের বৃষ্টিতে অধিক, আবার কোন স্থানের বৃষ্টিতে অল্প সারভাগ থাকে। বৃষ্টিজলের সারময়তা প্রতিপাদন করিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান বা গবেষণার আবশ্যক করে না। দুইটী একই গাছকে স্বতন্ত্রভাবে এক-একটী গামলায় রোপণ করিয়া, বৃষ্টির সময়ে একটীকে বাহিরে, অপরটীকে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলে, দুই চারি দিবসের মধ্যেই বৃষ্টির জলের উপকারিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। বর্ষাকালে গাছে তরলসার দিবার পক্ষে

একটী আপত্তি এই যে, এই সময়ে বারিপাতের প্রভাবে তাবৎ উদ্ভিদই বিনা সার-সাহায্যে বাড়িতে থাকে; সুতরাং তখন আবার তরলসার দিলে অনেক সময়ে গাছের বৃদ্ধির আতিশয্য হয়; আবার অনেক সময়ে উদ্ভিদগণ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়ায়, কতক সার বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া বাহিরে চলিয়া যায়, কতক সার ভূগর্ভের ভিতর দিয়া ছিদ্রপথ সংযোগে বহুদূর নিম্নে চলিয়া যায়। উদ্ভিদগণ যখন আহারীয় পদার্থকে আহরণ করিতে সমর্থ হয় এবং শরীরস্থ করিতে সক্ষম হয়, তখনই উহা প্রযোজ্য। অতঃপর ইহাও বলিয়া রাখি যে, গোময়, খইল বা অন্য কোন পদার্থ সদ্য জলে গুলিয়া গাছের গোড়ায় দিলে এবং পরে গোড়ায় মাটি নিড়াইয়া মাটির সহিত সারকে মিশাইলে মৃত্তিকামধ্যে একটী উত্তাপ জন্মে। এই উত্তাপবশে সারমধ্যে বিগলনক্রিয়া সম্পাদিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা গাছের ক্ষতি হইতে থাকে, অল্পোত্তাপে গাছ ঝিমাইয়া যায়, অধিকোত্তাপে মরিয়া যায়। আর এক কথা, টাট্‌কা সারে অনেক সময় উই-পোকা লাগে এবং সেই উই-পোকা গাছের গোড়া কাটিয়া দেয়; সুতরাং ইহাও এক বিশেষ আপদ।

সমাপ্ত।

কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ববিৎ

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত

কৃষিগ্রন্থাবলী।

বঙ্গের কৃষি ও উদ্যান বিষয়ক একমাত্র বিশ্বস্ত ও ব্যবহারিক

পুস্তক ঃ

বেঙ্গল, গবর্ণমেণ্টের পৃষ্টপোষিত

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর উপযোগী বলিয়া

সেণ্ট্রাল-টেক্স্ট-বুক-কমিটীর অনুমোদিত ঃ

সংবাদ পত্রে ও সাধারণ্যে ভূয়ো প্রশংসিত।

উক্ত গ্রন্থাবলী সম্পর্কীয় প্রত্যেক পুস্তকে কি কি

লিখিত হইয়াছে—

তাহার সূচীপত্র পর-পৃষ্ঠাবলীতে প্রদত্ত হইল।

প্রাপ্তি স্থান—

দে এণ্ড সন্স, ২৭।১ বিডন রো, কলিকাতা

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী (গুরুদাস বাবুর দোকান)

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। কৃষিক্ষেত্র।

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে)

(চতুর্থ সংস্করণ) মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রথম খণ্ডের সূচী—

প্রথম অধ্যায়—মূলধন, ক্ষেত্রস্বামী, কাম-জারি, মিতব্যয়িতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—কৃষি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, মৃত্তিকা-পরীক্ষা, মৃত্তিকা বিচার।

তৃতীয় অধ্যায়—জলের বন্দোবস্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—ক্ষেত্র বিভাগ ও তাহার উপকারিতা, আল, জল ও মৃত্তিকা, সোরাজান, রস ও সার।

পঞ্চম অধ্যায়—সারের প্রয়োজনীয়তা, ভূমির সমতলতা, আবশ্যকীয় গৃহাদি, কোদাল কোদালে ও কোদলান, লাঙ্গল ও লাঙ্গলবাহী, হলচালনার সময়, চৌকী মদিকা ও বিন্ধক।

ষষ্ঠ অধ্যায়—মৃত্তিকার রস-সঞ্চালন, ছিদ্রপথ, অক্ষত জমির উর্ব্বরতা, মৃত্তিকার বিশ্রাম, বেলেমাটি, লোনামাটি, জমি পুড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্য, জল বায়ু ও সারের সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ, সব্জীসার, পাতাসার, খৈল, ভিন্ন ভিন্ন পশুর মল-মূত্র ও অস্থিসার, চূণ, নাইট্রেট-অব-সোডা, লবণ, সোরা, ঝুল ও ভুষা, পলিমাটি, ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য ও সময়, গভীর ও ভাসা চাষের তারতম্য। আবাদপর্য্যায়, বীজনির্ব্বাচন, ফসলের স্থায়ী উন্নতি ও তাহার উপায়, বীজ রক্ষণ, বীজ বপন, নিড়ানি, ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী—

ধান্য, পাট, তামাক, তিসি বা মসিনা, ইক্ষু, তিল, সর্ষপ, বুট বা ছোলা, হরিদ্রা, কার্পাস, আদ্রক, কাঁওন আলু, মটর, যব, অড়হর, গোধুম, মুগ, ভুট্টা, মসুর, লঙ্কা, ধনে, আরারুট, মৌরী, মাট-কড়াই বা চীনের বাদাম, এরণ্ড, পিপ্পলী।

২। সব্জীবাগ।

(ষষ্ঠ সংস্করণ) মূল্য ॥০ আনা।

সূচী পত্র।

বেতুয়া শাক, পালঙ-শাক, চুকা-পালঙ, বরবটী, সীম, স্কোয়াস, সা-জীরে, শসা, লাউ, ভুট্টা, লঙ্কা, সেলেরি, আম-আদা, মেথি, ধনিয়া, পুদিনা, পিপারমেণ্ট।

নবম অধ্যায়—নটে শাক, ডেঙ্গো-শাক, বিলাতি বা মিঠে কুমড়া, সাঁচি বা চাল কুমড়া, কাঁকুড়,ঝিঙ্গে, পটোল,উচ্ছে, করলা, ধুঁধুল, চিচিঙ্গা, ঢেঁড়স।

দশম অধ্যায়—চুপড়ীআলু, রাঙ্গা আলু, শকরকন্দ-আলু, মানকচু, শোলাকচু, পঞ্চমুখী কচু, ওল।

একাদশ অধ্যায়—তরমুজ, খরমুজা,ফুটী, টেপারি, শাঁকালু, ষ্ট্রবেরি, কেশুর।

দ্বাদশ অধ্যায়— প্রদর্শনী, প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও উপকারিতা, সবজীর ব্যবসায়।

ফলকর।

(চতুর্থ সংস্করণ) মূল্য ॥০ আনা

সূচীপত্র।

মৃত্তিকা-তত্ত্ব।

মূল্য ১৲ টাকা।

সূচীপত্র।

অষ্টাদশ অধ্যায়—গ্রহের প্রভাব, নদী-জল, ভূমিকম্প, মৃত্তিকার বর্ণ সংস্কার।

ঊনবিংশ অধ্যায়—সেচন-সংজ্ঞা, সেচনের উদ্দেশ্য, সেচিত জল—না তরল সার, উর্ব্বরতা রক্ষা, সেচনের সময়, সেচনের নিয়ম, ময়লা জল, রস রক্ষার্থে বায়ুরোধ, উদ্যান ভূমির রসালতা।

বিংশ অধ্যায়— শুষ্ক-আবাদ, সুকর্ষণের সরঞ্জাম, নিম্নতলের পরিচর্য্যা, শুষ্ক-আবাদের ফসল।

একবিংশ অধ্যায়—রসরোধ, আবরণ কি? আবরণ-উপাদান, সতর্কতা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়—আগাছা, আগাছার শত্রুভাব, আগাছার উপকার, আগাছা বিনাশের উপায়, নিস্তৃণতা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—ফাও ফসল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়—উৎপাদিকা-শক্তি, ধরিত্রী-গর্ভ, শক্তিক্ষয়ের কারণ, অবিরত আবাদ, সম-জাতীয় উদ্ভিদ, রসাভাব।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—চাষ ও উর্ব্বরতা, সুকর্ষণের ফসল, খরচ ও যোগান বাঁজা-ভূমি।

ষড়বিংশ অধ্যায়—উর্ব্বরতার লক্ষণ, বারিকৃচ্ছতা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—উর্ব্বরতা রক্ষার উপায়।

অষ্টবিংশ অধ্যায়—ধৌত ভূমি, ধোয়াট-রোধ, ভূমির জিরেন, মৃত্তিকার আয়তন বৃদ্ধি।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়—বিরামকাল; পাতিত-জিরেন জিরেনের উপকারিতা।

ত্রিংশ অধ্যায়—পর্য্যায় আবাদ।

কার্পাসকথা।

মূল্য ॥০ আনা।

সূচীপত্র।

মালঞ্চ।

তিন খণ্ড একত্রে।

দ্বিতয় সংস্করণ মূল্য এক টাকা

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।

পঞ্চম অধ্যায়—গ্রিভিলিয়া-রোবষ্টা, দারুচিনি, তেজপত্র শিশু, দেবদারু, য়্যাকেসিয়া, ক্যাসিয়া, ডার্ভিস-রোবষ্টা, তুঁ মেহগ্নি, কথবল, সপেটা, লিচু, মাজস্থু, য়্যালবিজিয়া, য়্যালষ্টে নিয়া, বুটিয়া, ক্যাম্ফোরা, ফাইকস, দক্ষিণা-বট, বট, রবাঃ নিম্ব, বকায়েন, বকুল, ইউক্যালিপ্‌টস্, আমলকি।

ষষ্ঠ অধ্যায়—পাম, লিভিষ্টোনিয়া-রোটণ্ডা, অরিওডক রিজিয়া, য়্যারিকা-লুটিসেন্স, য়্যারিকা-ক্যাটেচু।

সপ্তম অধ্যায়— মরসুমী ফুল, মরসুমীর স্থান। শীতের মঃ সুমী,—ভায়োলেট,য়্যাষ্টর,য়্যাণ্টারহিনম, য়্যাক্রোলাইনম্,য়্যাঃ নিয়া-অম্বেলেটা, য়্যাডনিস-ইষ্টীভ্যালিস, য়্যাজিরেটম্ মেক্সি কেনম্, য়্যাগ্রষ্টিমা, য়্যাল্‌থিয়া-রোজিয়া, আইপোমপ্‌সিস্-এলি গ্যানস্, ক্যালেণ্ডিউলা, ক্যাণ্ডিটফ্‌ট্, ক্যাম্প্যানিউলা, ক্যাল্ সিওলেরিয়া, কার্ণেশন,ক্লার্কিয়া, ক্ল্যায়াম্বস্-ড্যাম্পিয়ারি, কন্‌ভল- ভিউলস্-মাইনর, করিয়প্‌সিস্, গেলার্ডিয়া, হিলিয়্যান্থস্, হিলি-ক্রাইসম্, লার্কস্‌পর্, লোবেলিয়া, লুপিন্‌স্, মেরিগোল্‌ড্, মিগ্‌নেট মিয়োসটিস্, ন্যাষ্টারশম্, প্যান্‌সি, পিটুনিয়া, পপি, ক্রকস্, ষ্টক্, সুইট-পী, ভার্বিণা, জিনিয়া, মার্ভেল-অফ-পেরু, পেণ্টাপিটিস্ বল্‌সম্, গম্‌ফ্রিণা, ধুতুরা, অপরাজিতা, জিনিয়া, স্বর্য্যমুখী।

অষ্টম অধ্যায়—রিবন, কার্পেট।

নবম অধ্যায়—পদ্ম, রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম, বড়শালুক, ভিক্টোরিয়া-রিজিয়া।

গোলাপবাড়ী।

(মূল্য ৵৹ আনা।

সূচীপত্র।

গম্বুজকার অবনামিত, বিভক্তাকার, মাল্যাকার, দাঁড়া-গাছ, গাছের শোভা।

নবম অধ্যায়—কলমের প্রকার, খণ্ড-শাখা, জোড়-কলম, চোঙ্গ-কলম, জিব-কলম, দাবা-কলম, বীজু।

দশম অধ্যাশ—গোলাগের শত্রু, উই পোকা, পতঙ্গ, লাল-মাকড়সা, সোঁয়া-পোকা, ধুমপ্রদান।

একাদশ অধ্যায়—গোলাপের তালিকা,হাইব্রিড-পার্পেচুয়াল, টী, নয়জেট, মস, বোরবোঁ, বোরসণ্ট, সুইট-ব্রায়ার, ডামাস্ক, জাইগ্যান্টিয়া, মাইক্রোফিলা।

দ্বাদশ অধ্যায়—গোলাপের সময়, অগ্রোৎপাদন, বিরাম ও জাগরণ, বৃদ্ধিরোধ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—সৌখিনের সখ, ব্যবসায়ীর পণ্য, আতর ও গোলাপ।

পশু খাদ্য।

(মূল্য ।০ আনা।

ইহাতে রিয়ানা, গিনী-ঘাস, লুসার্ণ, বরুঘাস, জুয়ার প্রভৃতি পশুদিগেগের পুষ্টিকর আহারোপযোগী ফসলের আবাদ প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চা।

(মূল্য ।০ আনা)

অশ্বাগন্ধা গাছ হইতে কিরূপে চা প্রস্তুত করিতে হয় ও ইহার আবাদ প্রণালী লিখিত হইয়াছে। উক্ত চা গ্রন্থকার নিজে

প্রায় তিন বৎসর কাল ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার ন্যায় সাধারণ স্বাস্থোন্নতিকর, স্নায়ুপুষ্টিকর ও শরীরউষ্ণকারী দ্রব্য বড় বিরল।

ভূমিকর্ষণ।

মূল্য ।৵০ আনা।

সূচী পত্র।

উদ্ভিদ খাদ্য।

মূল্য ॥০ আনা।

উদ্ভিদগণের বৃদ্ধি, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্যবিধান, ফলন-ফুলন প্রভৃতির জন্য কোন্ কোন্ সার প্রয়োজনীয়, নানাবিধ সারের বিবরণ ও উপকারিতা, সারের সহিত মাটির ও উদ্ভিদের কি সম্বন্ধ ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

delicious and luscious fruit in the world." **The Hindustan Review, July 1912.**

"Mr. De.........has co■plied a small but valuable treatise on the Mango...........the author has given us very valuable informations which must be studied by all Mango growers"... **The Madras Standard, 23-10-12.**

"The book before us on that delicious Indian fruit Mango, is most interesting and contains valuable informations." **The Amrita Bazar Patrika.**

"The writer who is well qualified by his experince for the task has spared no pains in collecting suitable materials and supplying reliable information in connection with the subject. The text ought to be of considerable help to those who wish to cultivate the fruit for the gratification of their stomach or for the filling up of their purse.

THE INDIAN MIRROR.

BY THE SAME.

POTATO CULTURE

(FOURTH EDITION)

Price —8 ans

CONTENTS—Natural habitat : Soil, Manure and Manuring ; Plots ; Seed potatoes ; Cultivation ; Treatment ; Treatment after planting ; Earthings ; Watering ; Top-dressing ; Dry culture ; Experiments with cuttings ; Harvesting ; Storing and clamping ; Potato pests ; Exhibition ; Costs of Cultivation &c.

"POTATO CULTURE is a valuable treatise on the system of growing potato."

THE STATESMAN.

"He is a practical man in its strictest sense and had immense resources for conducting his operations, he having been in charge of the farms and gardens of the premier houses of Bengal and Behar i. e. the Nizamat State, Murshidabad, and the Durbhanga-Raj. Special feature of his publication is that he never lacked in adding his subsequent experience in each edition. We recommend his books to the public with great confidence."

A. B. Patrika.

" The object of this book is to help the middle classes in the pursuit of agriculture which, in these days of dearth of employment is recommended as the only means by which one can earn a decent livehood."— The Indian Mirror.

"It gives excellent practical hints on the cultivation of potatoes, based on a long experience. Its being now in its Fourth Edition testifies to its worth.—The Hindustàn Review. Feb. 1912.

"This little brochure contains practical hints on the cultivation of Potatoes....... ....That a booklet on such a technical subject has undergone four editions is sufficient testimoney to its merit.

The Indian Daily News. June 7-1911.